অধ্যায় - ০৪

মঙ্গলকাব্যে নারী চরিত্রগুলির অবস্থান পর্যবেক্ষণ

সাহিত্য দেশের অন্দর-মহলের চিত্রকে তুলে আনে টেনে-হেঁচড়ে। কবি-সাহিত্যিকরা তাঁদের চারপাশের চেনা জগৎকে নিজ-মনের মাধুরী মিশিয়ে সাহিত্যের রস-সমুদ্রে ডুব দিয়ে তাল তাল করে শব্দের মুক্তা-বেণী সাজিয়ে পাঠক-হৃদয়কে রসসিক্ত করে তোলে। শুধু চেনা বাস্তব ছাড়া কবিরা আশ্রয় নেয় কল্প-লোকের মায়া জালে। বাস্তব জগতের অপূর্ণতা, অপ্রাপ্তির শূন্যতাকে কবিরা কল্প-লোকের মায়াবী নেশায় নিজের মত করে ভরিয়ে তোলেন। তাইতো যে কালেরই সাহিত্য হোক না কেন, সর্ব কালের সাহিত্যের মধ্যে বাস্তব আর কল্পনা মিলেমিশে রাজত্ব চালায়। বিশেষ দেশ-কাল ও তার অধীনে থাকা মানুষকে নিয়ে সাহিত্যের উদ্ভব। মধ্যযুগের সাহিত্যও এর ব্যতিক্রম নয়। মধ্যযুগীয় নগ্ন বাস্তব আর কল্পনাশ্রিত নর-নারীর কথাকে কেন্দ্র করে সেকালের সামাজিক চিত্রের স্বরূপে গড়ে উঠেছে অন্যান্য কাব্যের মত মঙ্গলকাব্য গুলিও। সে যাই হোক সব মিলিয়ে মধ্যযুগের কাব্য সমকালীন দেশ-কাল-সমাজের এবং সেই সময়কার পাত্রপাত্রীর পুঙ্খানুপুঙ্খ দলিল।

মঙ্গলকাব্য দেব-দেবীদের মাহাত্ম্য প্রচারে সমৃদ্ধ। তবে এ দেব-দেবীরা বাস্তবজীবনের ক্ষেত্রেও সাধারণ নর-নারী রূপে ধূলি-ধূসরিত পৃথিবীতে নেমে এসেছেন। পৌরাণিক কাঠামোকে গ্রহণ করলেও মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, আনন্দ-বেদনা প্রভৃতি নিয়ে যে জীবন, তারই সূত্রে সমাজের বিশ্বস্ত পরিচয় মঙ্গলকাব্যের পাতায় পাতায় উঠে এসেছে। এ কাব্যে পল্লী বাংলার সামগ্রিক রূপ প্রকাশিত। লৌকিক উপাদানে আর বাস্তব চরিত্রে মঙ্গলকাব্যগুলি বাংলার জাতীয় কাব্যের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। মঙ্গলকাব্য মাটির সম্পদ। এ কাব্যে রয়েছে সোঁদা মাটির গন্ধ। মঙ্গলকাব্য এবং তৎকালীন সমাজের মত 'শেষের কবিতা'র লাবন্য আর অমিতের কথোপকথনে উঠে আসল-

''গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়''

এবং এ কাব্যের সমাজ ও সাহিত্য একে অপরকে দিয়ে বলে নিল-

''যদস্তু হৃদয়ং তব, তদস্তু হৃদয়ং মম''।

মধ্যযুগের বিভিন্ন কাব্যের নারী চরিত্রের তুলনায় মঙ্গলকাব্যের নারীরা বৈচিত্র্যময়ী। এ নারী সজীবতায়, সরলতায়, প্রাণবন্ত মমত্বে, বিদ্রোহিণীর স্বতন্ত্র দীপ্তিতে ভাস্বর। সমাজের প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক শোষণ-বৈষম্যের বিরুদ্ধে পুরুষ-কবিরা প্রতিবাদী নারীকণ্ঠস্বরকে আকাশে-বাতাসে শমিত করে তুলেছেন।

চন্ডীমঙ্গল: মঙ্গলকাব্যের বাইরে পুরাণ, অন্তরে মানব। বিভিন্ন দেব-দেবীর জন্ম, ঘর- সংসার, কলহ- দ্বন্দ্ব; উপরন্তু নিজ আত্ম-প্রতিষ্ঠার তাগিদের উপাখ্যান মঙ্গলকাব্যের বাইরের রূপ। আর কবিরা

এর মধ্যে যে কাহিনি- বলয়ের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছেন তা একান্তভাবে মানবিক। শিবজায়া দেবী চন্ডীর মাহাত্ম্যকে নিয়ে গড়ে উঠেছে চন্ডীমঙ্গল কাব্যখানি। চৈতন্যযুগের ফসল 'চন্ডীমঙ্গল'। চন্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনিতে দুটি উপাখ্যান- ক) কালকেতু উপাখ্যান, খ) ধনপতী- শ্রীমন্ত উপাখ্যান।

কালকেতু উপাখ্যানে চন্ডী- মাহাত্ম্য, অনার্য দেবী চন্ডীর প্রতিষ্ঠা ও স্বীকৃতি লাভের জন্য যেন-তেন কর্মে নিযুক্ত হয়েছেন, আর পরিশেষে পেয়েছেন কিছুটা স্বীকৃতি; তবে ব্রাহ্মন্য-সংস্কৃতির দাপুটে রাজত্বে সম্পূর্ণ স্বীকৃতি না পেয়ে গুজরাট অরণ্যে হয়েছে তাঁর অধিষ্ঠান।

দ্বিতীয় উপাখ্যানে অনার্য দেবী চন্ডী দেবাদিদেব মহাদেবকে অর্থাৎ পুরুষ-সমাজকে বুড়ো-আঙুল দেখিয়ে দাপুটে ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতিতে স্বাধিকার লাভ করেছেন। এ দুটো উপাখ্যান একে- অপরের পরিপূরক। প্রথম উপাখ্যানে যার জন্ম, দ্বিতীয় উপাখ্যানে তাঁর কর্ম।-

> ''প্রাচীন বাংলাসাহিত্যে প্রকৃত কবি বলিতে মাত্র দুইজন, এক মুকুন্দরাম ও দ্বিতীয় ভারতচন্দ্র। মুকুন্দরাম বাঙালীঘরের কবি, ভারতচন্দ্র রাজসভার কবি। **** ভারতচন্দ্রের রচনা মণিমালা, মুকুন্দরামের রচনা বনমালা **** একটি রাজকণ্ঠশোভা পাইবার যোগ্য, আর একটি ব্রীড়নতা পল্লীবালার কণ্ঠশোভা।''[১]

সাহিত্যবিচারের একটা প্রধান অঙ্গ চরিত্রচিত্রণ। এর-ই মধ্য দিয়ে বাস্তবতার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণী মনোভাব ফুটে ওঠে। মধ্যযুগের তথা চন্ডীমঙ্গলের কবি সার্বভৌম মুকুন্দের চরিত্র ভাবনার অন্তর্বলয়ে রয়েছে পৌরাণিক আধারে লোকায়ত জীবনের আশ্চর্য বিশ্লেষণী ক্ষমতা। বিশেষ করে নারী-চরিত্র সৃজনের মধ্যে কবির রয়েছে অসাধারণ ক্ষমতা। তিনি তো প্রতিটি ক্ষেত্রেই জীবনানন্দ দাশের মত একদিকে তুলে ধরতেন ইতিহাসকে, অপরদিকে তাঁর কালজ্ঞানকে। কবির ভষায়-

> ''কবির পক্ষে সমাজকে বোঝা দরকার, কবিতার ভিতরে থাকবে ইতিহাস চেতনা, মর্মে থাকবে কালজ্ঞান।''[২]

মুকুন্দ বাস্তবতার কবি। তিনি দরদী কবি। তিনি সমাজের কবি। তাঁর দৃষ্টিতে সমকালীন সমাজের চালচিত্র ফুটে উঠেছে নানান ভাবে। তাঁর সৃষ্ট নারী চরিত্রগুলির মধ্যে রয়েছে অবরোধ বাসিনীর আকাশ-অন্বেষণের বাসনা। আজ দেখার বিষয় হল সেই অবরোধবাসিনীরা কীভাবে তাদের নিজ স্বাধিকারকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তৎকালীন সমাজের কর্ণধারকে এবং সমাজ সংস্কারকে কীভাবে দুমড়ে-মুচড়ে দিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। চন্ডীমঙ্গলের চন্ডী সম্পূর্ণ রূপে পৌরাণিক নন, তিনি লোকায়ত সমাজের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। তিনি অন্ত্যজ ব্যাধকুল সমাজের অভয়দাত্রী, অরণ্যানী, পশুকুলের বরদাত্রী। তিনি মেয়েলি ব্রতকথার মঙ্গলচন্ডী। তিনি ভক্তের কাছে মঙ্গলময়ী-

কল্যানী, ভক্তিহীনের কাছে ক্রূরা, ভীষণা এবং প্রতিহিংসাপরায়ণা। তিনি ব্যক্তিত্বময়ী নারীসত্তা। যিনি 'নগেন্দ্র-নন্দিনী চন্ডী' তিনি এ কব্যের ব্যাধখন্ডে সতী, গৌরী নাম পরিবর্তন করে 'মঙ্গলচন্ডী' নামে আবির্ভূতা । তিনি তো 'বিঘ্ন বিনাশিনী ভৈরবী নন্দিনী' অর্থাৎ অন্ত্যজ শ্রেণিকে যারা শোষণ-উৎপীড়ণ রাহাজানির কবলে দলিত-পদদলিত করেছে। সেই সমাজের উঁচুতলার বাসিন্দাদের 'বিনাশ' করতে দেবী চন্ডী মানবিক রূপ ধারণ করে 'বিনাশায়চ দুস্কৃতম' রূপে আবির্ভূতা। এরপর কবিরা হর-গৌরীর সাংসারিক কলহের মধ্যে নারীসত্তার জাগরণ ঘটিয়েছেন, আর বলেছেন- ''উচিৎ কহিতে আমি সবাকার অরি''। এবং অবসাদ ও খেদ এমন জায়গায় পৌঁছায় যার জন্য গৌরী বলে-

'' কি কহিব সহচরী মনের বিরল কথা।
মিথ্যা নারী করিয়া মোরে সৃজিলা বিধাতা।।

*** *** ***

দোষ বিণে প্রভু মোরে বলে কটুত্তর।
একা বসি থাক শিব ছারড়ি যাব ঘর।।''[৩]

কবি মুকুন্দ গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণনার মধ্যে দিয়ে পুরুষশাসিত সমাজকে পরাজয় করিয়েছেন। চন্ডীমঙ্গলে নারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দৃঢ়চেতা মনোভাব গঙ্গার মাহাত্ম্য কথার মধ্যে লক্ষ্য করি। গঙ্গা যখন শিবের কাছে বলে আমি কি রূপে মর্ত্যে প্রতিষ্ঠিত হব। তখন শিব বলেন-

''সিব বলে মর্থে জাইতে ভএ কর তুমি।
কেমতে ধরিবে নাম পতিত পাবনি।।''[৪]

এসময় শিব জটে হাত দিয়ে কথা বলতে ছিল-তখন গঙ্গার দৃঢ়চেতা মনোভাবের পরিচয় পাই আমরা। গঙ্গা তার নিজ অধিকারে, নিজের প্রবল ইচ্ছাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ''সিবের জটা হৈতে নামিল নারাঅনি।''[৫] ভগীরথ 'সংখধ্বনি' করে গঙ্গাকে সঙ্গে নিয়ে হিমালয় থেকে প্রস্থান করে। গঙ্গার প্রস্থানে শিব ''গঙ্গা ২ বলি সিব ধরিণি লোটাএ।''[৬] গঙ্গা দক্ষিন মুখে চলতে শুরু করে, এর পর তিনি পৌঁছান নেপালে, সেই আনন্দে নেপালের রাজা জয়ধ্বনি দিয়ে গঙ্গার পূজা করেন। আর সেখানে গঙ্গা সাত রাত থেকে আবার দক্ষিন মুখী হন। পঞ্চম দিনে তিনি বারানসি পৌঁছান, এরপর তিনি ''বারাণসির উত্তরে বহিলা গঙ্গা।''[৭] এ সময় ত্রিপুর অসুর নামে এক দৈত্যের সঙ্গে গঙ্গার বাদানুবাদ চলে। এবং নারীর এই আত্মপ্রতিষ্ঠার তাগিদ দেখে পুরুষশাসিত সমাজ সহ্য করতে না পেরে গঙ্গাকে তেড়ে মারতে আসে--

''ত্রিশুল তাড়িআ দুত মারিবারে আইল।
ক্রোধ করি গঙ্গা পুন হিমালএ চলিল।।
তিন ক্রোশ উত্তরে চলিল নারাঅনি।
বারানসি হৈতৈ গঙ্গা উত্তর বাহিনি হৈল।।[৮]

এরপর মুণিগণ ও দেবতারা চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং শিবের কাছে গিয়ে সবিস্তারে বর্ণনা করেন। এ কথা শোনার পর শিব রওনা দেন গঙ্গার উদ্দেশ্যে। তবে আশ্চর্য বিষয় যিনি দেবাদিদেব মহাদেব অর্থাৎ পুরুষশাসিত সমাজের কর্ণধার তাঁকেও তার স্ত্রী-গঙ্গার কাছে নতিস্বীকার করতে হয়, আর তাতে গঙ্গা খুশি হন।

'' ভোবানি শহিতো সিব করিল গমন।
গঙ্গার সনে পথে হৈল দরশণ ।।
সিব বলে খেমা কর গঙ্গা ঠাকুরাণী।
সিবের শ্রবণে তুষ্ট হৈল নারাঅনি ।।
পুনচএ হৈল গঙ্গা দক্ষিন বাহিনী।''[৯]

চন্ডীমঙ্গলের ফুল্লরা জটিল নয়, জীবন্ত, প্রয়োজন বোধে চতুরতা ও ছলনার আশ্রয় নিয়েছে। ফুল্লরাকে সমস্ত সমালোচকরাই পতি-পরায়ন স্ত্রী রূপে অঙ্কন করেছেন। ফুল্লরা অন্ত্যজ শ্রমজীবী রমণী। কিন্তু কবি মুকুন্দ তো সচেতন শিল্পী, তিনি তো অতি সহজে এত সুন্দর একটি চরিত্রকে প্রতিবাদী সত্তা থেকে বাদ দিতে পারেন না। তাই তো তার নামকরণ থেকে শুরু করে সমস্ত দিকে কড়া নজর রেখেছেন। 'ফুল্লরাব' শব্দ থেকে ফুল্লরা নামটি এসেছে। যার অর্থ-

> ''ফুলের মতো মৃদু ও লঘু যাহার কথা। আবার ফুলের উপরে যে মউ মাছি বসিয়া গুঞ্জন করে, সেই রকম মৃদু গঞ্জনাও আছে ফুল্লরার কণ্ঠে; সেই রকম মৃদু গুঞ্জনেই মনে পড়িয়া যায় যে জীবটি মধুর ভান্ডারি।''[১০]

কবি ব্যাধ-কন্যা ও ব্যাধপত্নীকে ফুল্লরা নাম দিয়ে প্রহসনের আড়ালে সমাজ-বাস্তবতাকে সংশোধন করে নেবার চেষ্টা করেছেন।

ফুল্লরা সঞ্জয় কেতুর কন্যা, কালকেতুর স্ত্রী। সে পতিব্রতা, আবার কখনো বিদ্রোহিণী নারী। সে পরিশ্রমী। উপার্জণের জন্য হাটে সে করে বিকি-কিনি। সে মধ্যযুগীয় নারী সমাজের প্রতিনিধি। আবার এ কাব্যের কবি ফুল্লরাকে স্বামী-দেবতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড় করিয়েছেন। একদিন যখন ফুল্লরা ঘরে এসে দেখে এক পরমা সুন্দরী তার ঘরে রয়েছে। ফুল্লরা তাকে চলে যাবার জন্য শত অনুরোধ করে,

দুঃখের কথা বলে, কিন্তু সে ঘর ছাড়ল না তখন বাধ্য হয়ে ফুল্লরা গোলাহাটে স্বামীর কাছে আসে। আর এখানে ফুল্লরা তার স্বামী-দেবতাকে যে ভাষায় অভিযুক্ত করল তাতে ফুটে উঠেছে বিদ্রোহিণী নারী সত্তার জাগ্রত রূপ।

''পিপীড়ার পাখা উঠে মরিবার তরে।
কাহার ষোড়শী কন্যা আনিয়াছ ঘরে।।
বামন হইয়া হাত বাড়াইলে শশী।
আখেটীর ঘরে শোভা পাইবে উর্ব্বশী।।''[১১]

সতীনের প্রতি বঙ্গললনার ছিল সহোদরার মতো ভালোবাসা। কিন্তু চন্ডীমঙ্গলের কবি মুকুন্দ জানিয়েছেন যে সতীনের আগমন বার্তা মৃত্যুর চেয়ে অধিক। পুরুষ তার দেহসুখ মেটাবার জন্য একাধিক নারী-সম্ভোগ করত। এমন কি একাধিক বিবাহে কখনো পুরুষ সাত পাঁচ ভাবতো না। মধ্যযুগের নারীর ছিল না স্বাধীনতা, ছিল না আর্থিক উপার্জন ক্ষমতা, তাই তারা বাধ্য হয়েই পুরুষ স্বামীর একাধিক বিবাহকে শত কষ্টে হলেও মেনে নিত। স্বামী-দেবতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার মত সাহস ও ক্ষমতা তৎকালীন নারীর মধ্যে ছিল না, তাই স্বামীর উপর যাবতীয় রাগ পড়ত গিয়ে সতীনের ঘাড়ে। যার জ্বলন্ত উদাহরণ এ কাব্যের লহনা-খুল্লনার দ্বন্দ্ব। লহনা বিগতা যৌবনা। পুত্রহীনা। ধনপতি তার স্বামী। এইস্বামী যখন তরুণী সুন্দরী খুল্লনাকে দেখে বিবাহ করতে মেতে উঠল তখন এই পুত্রহীনা বন্ধ্যা লহনা সতীনের আগমন বার্তায় আশঙ্কিতা। অধিকার ভোগের ভয়ে এবং স্বামীর প্রণয়ের ভাগীদারের দুঃখ তাকে তেড়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। লহনার স্বামী সুচতুর। স্বামী ধনপতি তাকে নানাভাবে বোঝাবার চেষ্টা করে, কিন্তু মমতাময়ী লহনা পুরুষ-সমাজের অবিচারে নিষ্ঠুর হতে বাধ্য হয়। সূক্ষ্মমনস্তত্ত্ব বোধের শান্তি ভঙ্গকারী খলনায়িকা লহনা; যে সম্পূর্নত স্বামী সোহাগিনী, পতি-বিহনে তার ঘটুক সমস্ত দূরবস্থা, আজ স্বামী থাকলেও স্বামীর উপর তার কর্তৃত্ব নেই বলে সে আজ স্বামীহীনা। তাই তো আজ তার এ স্বামীর প্রয়োজন নেই।

খুল্লনা চন্ডীমঙ্গল কাব্যের ধনপতি আখ্যানের রোম্যান্টিক নায়িকা। শুধু রোম্যান্টিক নয়, খুল্লনা চতুরা ও গার্হস্থ্য। সে একান্ত বাস্তব, একান্ত পারিবারিক। ধনপতি সদাগর একদিন পায়রা উড়াচ্ছিল, সে সময় একটি পায়রা খুল্লনার বস্ত্রাঞ্চালে আশ্রয় নেয়। ধনপতি যখন পায়রাটি চাইল তখন খুল্লনা ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করে। এমনকি সে তার জেঠতুত ভগিনীর স্বামী জেনে তার সঙ্গে রসিকতার ছলে যে বাদানুবাদ করে তাতে তৎকালীন পুরুষের কপটতা ফুটে উঠে।

বালিকা বয়সে ধনপতির সঙ্গে তার বিয়ে হলেও সে বেশ ছলাকলা জানে। আবার ঝগড়া, মারামারি করতে পিছুপা হয়না। দেবতার পূজা প্রচারের দায়িত্ব যেহেতু তার কাঁধে, তাই অতি দুঃখ-

কষ্ট ভোগ করে অবশেষে এক সুখী জীবন অতিবাহিত করে। শেষপর্বে এসে আমরা দেখি রামায়ণের সীতার মত খুল্লনাও তার সতীত্ব পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু রামায়ণের কবি বর্গের চেয়েও মুকুন্দ ছিলেন বাস্তব সচেতন কবি, তাই তার লেখনীতে ফুটে উঠেছে তৎকালীন পুরুষ-সমাজের ঘৃণ্যতম রূপ। ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার পর বণিকেরা সকলে সকলের চেয়ে বড় প্রমাণ করতে গিয়ে কলহ-বিতর্কের সৃষ্টি হয়। শুধু কলহ নয় এই সময়ে ধনপতিকে আক্রমণ করে এবং তার স্ত্রী খুল্লনার উপর কলঙ্কিনীর দোষারোপ করে। তারা বলে ধনপতির প্রবাস কালে খুল্লনা ছিল বনচারিণী। এমনকি খুল্লনা যখন শতশত বনচারী মাতালের সঙ্গে একাকিনী ছাগল চড়াতেছিল তখন তার গুণগান না করে বরং তাকে সমাজ থেকে বহিস্কার করা ভাল। আবার এও বলে খুল্লনা যদি পরীক্ষা দিয়ে সতীত্ব প্রমাণ করে এবং ধনপতি যদি সমাজকে একলক্ষ টাকা জরিমানা হিসেবে দেয় তবেই খুল্লনার কলঙ্কিনীর দাগ মুছে যাবে। এ হল তৎকালীন সমাজ-শাসকের সামাজিক বিধান! যারা অর্থের মানদন্ডে নারীর সতীত্ব যাচাই করতে চায়। নারীর উপর বঙ্গ-সমাজপতিরা কি ধরণের নির্মম নির্যাতন চালাত তার প্রমাণ মেলে খুল্লনার সতীত্ব পরীক্ষার মধ্যে। তারপর তাকে জলে ডোবানোর চেষ্টা করা হল, দংশন করানো হল বিষধর সাপ দিয়ে, জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় উত্তপ্ত ঘট তার হাতে প্রদান করা হল। যখন তাতেও খুল্লনার কোন অনিষ্ট সাধন করা গেল না তখন সমাজপতিরা বলে-

‘‘কহিছে মাধব চন্দ্র নাঞি নেয়াই নাহি দ্বন্দ্ব
বারিলে অনল হয় জল।
তঙ্কা দেকু এক লাক ঘুচাব সকল পাপ
পরীক্ষায় নাহি ফলাফল।।’’[১২]

বারংবার পরীক্ষা দিয়েও খুল্লনার নিস্তার নেই। অবশেষে জতুগৃহে বন্দী করে অগ্নিসংযোগ করা হল। জতুগৃহ পুড়ে ভস্মীভুত হয়ে গেল কিন্তু খুল্লনার বিন্দুমাত্র অনিষ্ট হল না, বরং সতীত্বের মহিমায় মহিমান্বিতা খুল্লনা অম্লান জ্যোতিস্কের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এরপর পুরুষশাসিত সমাজপতিরা ভয়ে ভীতগ্রস্থ হয়ে আপন দোষ স্বীকার করে নারী খুল্লনার চরণে ভিক্ষা মাগে। খুল্লনা যে এত সময় নীরব ছিল, তার মধ্যেও ছিল প্রতিবাদী সত্ত্বা। কারণ নীরবতার এক নাম বিদ্রোহ, প্রতিবাদ।

এ কাব্যের লহনা-খুল্লনার পাশে দুর্বলা দাসী এক সজীব চরিত্র। ধনপতির প্রবাস-কালে লহনা এবং দুর্বলা শলা-পরামর্শ করে ধনসম্পত্তি রক্ষা করেছে। সে নিজ সম্বন্ধে সচেতনা। তাই দুই সতীনের সহোদরার সম্পর্ক দেখে, সে ভাবে, যে তার স্থান অতি নীচে নেমে যাবে, তাই কূটচক্রী দাসী তার চক্রান্তের জাল ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে দিয়েছে।

মেনকা উমার জননী। স্বামী হিমালয় নারদের সঙ্গে পরামর্শ করে শিবের সঙ্গে গৌরীর বিবাহ ঠিক করেছেন। গৌরীর বিবাহ সম্পন্ন হবার আগে পর্যন্ত মা মেনকা যেন তৎকালীন সমাজ-বাস্তবতায় তৈরী। শিবের মদনমোহন রূপের পূর্ব-মুহূর্ত পর্যন্ত মেনকা যেন আমাদের ঘরের কোন মা। যে কোন মায়ের মত মেনকারও শিবের বিবাহবেশ দেখে ক্ষুব্ধ হওয়ার কথা। শিব এসেছেন 'বৃষভ' বাহনে, পরিধানে বাঘছাল, সর্বাঙ্গে বিষধর সাপ, এইরূপ দেখলে যেকোন মায়ের মত মেনকাও রেগে গিয়ে হিমালয়কে যে কথা বলেছেন, তা বলা অতি স্বাভাবিক-

''হেনবরে বিবাহ দিল কি দেখি সম্পদ।
বাপ হয়্যা মূঢ়মতি কন্যা করে বধ।।''[১৩]

এরপর নিদয়ার মধ্য দিয়ে সমাজ-বাস্তবতার ছবিকে আমরা প্রত্যক্ষ করি। সে ধর্মকেতুর স্ত্রী, কালকেতুর মা, ফুল্লরার শাশুড়ী। সে নিজে হাতে বালিকা বধূ ফুল্লরাকে গোষ্ঠীগত রীতিনীতি, শিকার করা মাংস বিকি-কিনির শিক্ষা দেয়। হীরাবতী সঞ্জয়কেতুর স্ত্রী, ফুল্লরার মা। চন্ডীমঙ্গলের প্রত্যেক কবি নিদয়া সম্পর্কে কিছু সংলাপ ব্যবহার করলেও হীরাবতী সম্পর্কে তেমন কোন কথা বলেননি। আর মুরারী শীলের স্ত্রীর মধ্যে রয়েছে চতুরা নারীর বাস্তব রূপ। কালকেতু যখন দেবীর প্রদত্ত আংটি বিক্রি করার জন্য মুরারী শীলের বাড়িতে যায়, বাড়িতে তখন মুরারী শীল ছিল না কিন্তু মুরারী শীলের স্ত্রী যে ধরনের ব্যবসায়িক বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে তা সত্যিই অতুলনীয়। এর মধ্যে রয়েছে স্বার্থপর দুষ্টুবুদ্ধি, চতুরা বেণে-রমণীর বাস্তব রূপ। লীলাবতী নামে যে আর একটি চরিত্র রয়েছে, যে লহনাদের প্রতিবেশিনী কুচুটী স্বভাবের, সে লহনা-খুল্লনার কলহে যে কোনো ভূমিকা নিতে দ্বিধা করে না। স্বামীকে বশ করার জন্য সে দেয় জড়িবুটি, এমনকি সতীনকে বিপর্যস্ত করার জন্য জাল চিঠি তৈরী করতেও তার বাঁধে না। এর থেকে বোঝা যায় মধ্যযুগের চন্ডীমঙ্গলের কবিবর্গ যতই পুরুষ হন না কেন তবুও তাঁদের কলমে ফুটে উঠেছে অবরোধ বাসিনীর প্রতিবাদী-বিদ্রোহিনী সত্তার স্বাধীনতা স্পৃহার শঙ্খ-ধ্বনী।

ধর্মমঙ্গল: কাব্যখানি অর্বাচীন কালের ফসল। 'ধর্ম' ঠাকুরের মাহাত্ম্য বর্ণনার উদ্দেশ্যে 'ধর্মমঙ্গল' কাব্য রচিত। মধ্যযুগের কাব্যাকাশে ব্যতিক্রমী সৃষ্টি। 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের প্রধান উপজীব্য বিষয় যুদ্ধ। এ কাব্যে সুখ-দুঃখ, বিরহ-মিলন, প্রীতি-মমতা-ভালোবাসা থাকলেও তা কিন্তু পরবর্তীতে যুক্ত হয়েছে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে। যুদ্ধ-ই এ কাব্যের প্রাণকেন্দ্র। একাব্যের প্রতিটি নারী চরিত্র তাদের নিজস্ব ভাবনায় ভাস্বর। এরা প্রত্যেকে তাদের নিজ অধিকার আদায় করতে কখনো পুরুষকে, কখনো পুরুষশাসিত সমাজকে আবার কখনো প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজয় করতে উঠে-পড়ে লেগেছে। এরা প্রত্যেকে বীরাঙ্গনা। ধর্মমঙ্গল কাব্য মধ্যে যে সমস্ত নারী চরিত্রের সন্ধান মেলে, তারা হল- ১) রঞ্জাবতী, ২)

কানড়া, ৩) কলিঙ্গা, ৪) লক্ষ্মী ডোমনী, ৫) সুরিক্ষা, ৬) নয়ানী, ৭) ভাজন বুড়ি, ৮) সফুল্লা, ৯) হীরা নটিনী, ১০) দুর্গা, লাউসেনের আরও দুই স্ত্রী বিমলা এবং অমলা, জয়া, বিদ্যা, রসবতী, নীলা প্রমুখ পরিচয় মেলে।

'ধর্মমঙ্গল' কাব্য-মধ্যে যে সমস্ত নারী চরিত্র রয়েছে তার মধ্যে ভাস্বর রঞ্জাবতী। রঞ্জাবতীর দুঃসাধ্য কঠোর তপস্যা ও বর-লাভের মধ্যে দিয়ে কবিরা আমাদের পরিচয় ঘটান তার সঙ্গে। দেবতাকে তথা পুরুষ- শাসিত সমাজের কর্ণধারকে সন্তুষ্ট করতে নারীকে কৃচ্ছ্রসাধনার দ্বারা নানান অমানুষিক অত্যাচার, নির্যাতন সহ্য করতে হয়। এই নির্যাতন মুখ-বুঝে সহ্য করার কারণও কবিরা তুলে ধরেছেন। এর মধ্যে খুঁজে নিতে অসুবিধা হয় না, যে, নারীরা তাদের কষ্ট-সহ্য করার পিছনে মূক হয়ে প্রতিবাদের ভাষা বলে দিচ্ছেন পুরুষ-শাসিত কর্ণধারদের। পুত্রবর-প্রার্থী রাণী রঞ্জাবতীর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সাধনায় স্বয়ং সূর্যদেব তাঁর কাছে হার মানতে বাধ্য হয়েছে। কারণ-

''পুত্র বিনা গৃহ যেন পদ্মপত্রে জল।
জলবিম্ব যেন নাথ জীবন চঞ্চল।।
*** *** ***
জীবন বিফল যার পুত্র নাই রায়।।
আঁটকুড়া লোকে বলে মুখ নাহি চায়।
সংসার সম্পদ সুখ সকল বিফল।।''[১৪]

এ তো সেকেলে কথা নয়, আজও সংবাদপত্রের পাতায় পাতায় এ রকম হাজারো সংবাদ আমরা পেয়ে যাই। মাল্টিমিডিয়ার দৌলতে আজও দেখা যায়, যদি কোনো নারী পুত্র সন্তান জন্ম দিতে অপরাগ হন তাহলে তার কপালে নেমে আসে মৃত্যু-সম বাণ। শুধু বাণ নয়, মৃত্যুর কোলে তাকে পাঠিয়ে দিতে আজকের সমাজের কর্ণধারেরা সেই নারীর উপর চালায় অকথ্য অত্যাচার। এমনকি কেরোসিনের আগুনে তাকে দেয় জ্বালিয়ে। সমাজের চোখে রঞ্জা আঁটকুড়ে, আর তার স্বামী বয়সের ভারে যে সন্তান উৎপাদনে অক্ষম, তিনি দিব্যি মহারাজ! তাঁর নেই কোনো দোষ। সেকালের মত আজও নিজ স্বামীর দোষের কথা কেউই স্বীকার করতে চায় না। চায় না তার স্বামী সন্তান সুখ থেকে হোক বঞ্চিত। রঞ্জাও চায়নি। তাই রঞ্জা নিজ জীবনকে বাজি রেখেও স্বামী-সুখের কথাকে মাথায় রেখে, নিজের প্রাণকে বিসর্জন দিতে তৈরী। সমস্ত নারী-কুলের কাছে 'বন্ধ্যা নারী'-র অপবাদ খুবই দুঃখের। তাই যেন-তেন প্রকারে রঞ্জার আজ পুত্র সন্তান চাই। সন্তান লোভাতুরা রঞ্জা বীভৎস মৃত্যু যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করে মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে উঠতে তৎপর। তাই ধর্মঠাকুর নিজেকে স্থির রাখতে না পেরে চলে এলেন রঞ্জার কাছে। কারণ যদি না আসেন তাহলে যে ধর্মঠাকুরের উপরেই সমাজের অগনিত

মানুষেরা অপবাদ দিবে। এই অপবাদের ভয়ে এবং নারীকুলের ধাত্রী, রাণী রঞ্জাবতীর কাছে হার স্বীকার করেছেন। শালে ভর আখ্যানের মধ্যে একদিকে যেমন আছে রঞ্জাবতীর সন্তান লোভাতুরা হৃদয়ের পরিচয়, তৎসঙ্গে রয়েছে বাৎসল্য-আকাঙ্ক্ষিনী রমণী রঞ্জাবতীর বীভৎস মৃত্যুযন্ত্রণার অক্লেশ যন্ত্রণার ছবি। আবার এও ঠিক কবিরা মৃত্যুযন্ত্রণাকে তুচ্ছ করে মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে ওঠার বাসনাকে বাস্তবায়িত করে তুলতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। সূর্যদেব প্রেরিত নিরঞ্জন অর্থাৎ পুরুষ-শাসিত সমাজের কর্ণধার তাঁর আপন ব্যক্তিত্বকে জলাঞ্জলি দিয়ে ধর্মের কৃপায় রঞ্জা আজ 'পুত্রবর' লাভ করেছে, শুধু 'পুত্রবর' নয় রঞ্জা তো পুনর্জীবনও লাভ করেছে।

ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের নারী চরিত্র গুলির মধ্যে রঞ্জাবতী স্বমহিমায় ভাস্বর। কবিরা একদিকে যেমন রঞ্জাবতীর পুত্র আর্তিকে রসঘন করে তুলেছেন তেমনি লাউসেনের গৌড় যাত্রাকালে পুত্র-বিরহের আসন্ন বিরহে মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুল হাহাকার ধ্বনি কবি ঘনরামের মত অন্যান্য সব কবিরাই নিখুত চিত্র শিল্পের তুলিকায় অঙ্কন করেছেন। রাণী রঞ্জাবতীর মধ্যে আমরা খুঁজে পাই স্নেহ বাৎসল্যময়ী মা, শাশুড়ির পরিচয়। আবার পাই পতি ভক্তি পরম ধর্মের পরিচয়। রঞ্জাবতী শুধু মা নন। রঞ্জা পতিব্রতা নারী।

'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে রঞ্জাবতীর শালে ভর দেবার পালায় 'আমুলা' 'সামুলা' একজন নারী পুরোহিতকে আমরা খুঁজে পাই। ইনি ধর্মঠাকুরের পরিচালিকা। ইনি নারী সমাজের প্রতিনিধি। ইনি সমাজের নানান দৃষ্টিভঙ্গির নেত্রী। রঞ্জাবতীর পুত্র-কামনায় একনিষ্ঠ সাধিকার পাশে সামুলার যেমন পরিচয় পাই তেমনি লাউসেনের 'পশ্চিমে উদয় পালা'য় তাঁকে বিদ্ধগ্ধা সেবিকা রূপে পাই। নারী হয়ে অগাধ পান্ডিত্যের অধিকারিণী। পুরুষ-সমাজের বীর লাউসেন ও তাঁর কাছে বুদ্ধি চেয়েছে। সত্য কথা বলতে কী পুরুষ- প্রধান সমাজে নারীরা শোষিতা, অবহেলিতা, নির্যাতিতা শত উৎপীড়ন সহ্য করেও তাদের ছিল না স্বাধিকার, এমনকি নারীর ছিল না মন্ত্রোচ্চারণে অধিকার, এ কাব্যের কবি-বর্গ দেখিয়ে দিলেন যে, নারী পারে পুরোহিত হতে, এবং নারীর নির্দেশিত পথে পুরুষ সমাজপতিরা হন অগ্রসর।

কলিঙ্গা যুবতী কন্যা। তার কাছে বাবা একটিবারের জন্য শুনল না যে তার বিয়ে ঠিক করা হচ্ছে। কালুডোম বলছে 'শুভ কর্ম্ম আর কেন ব্যাজ।' এ শুনে রাজা বলেন আগে একটু বাড়িতে যাই। ঠিক আছে, বলে কালু গেল তাঁর সঙ্গে। রাজাকে দেখতে পেয়ে রাণী 'আনন্দে বিভোলা'। রাজার কাছে সব শুনে রাণীর অন্তর থেকে যে কথা বের হয়ে এলো, সেকথা সেকেলে মায়ের কথা নয়, একালের মায়ের বেলায়ও একই কথা। রাণী বলছেন আমাদের কন্যা 'কুলের পদ্মিনী' এবং রাণী একথাও বলতে ভোলেননি যে, যদি রাজা একাজ সম্পাদন করেন, তাহলে তো রাজধর্ম রক্ষা পায় না। কারণ- 'পরাজয় হয়ে কন্যা দিলো মহারাজ'। রাণী বলেছেন কুলের কথা, যে এভাবে মেয়ে

সম্পাদন করলে কুলের মান যাবে। এমনকি আমরা 'বরঞ্চ সকল ছেড়ে দেশান্তরি হই।' তিনি বলেছেন-

''কোথাকার বরে তুমি দিতে চাও ঝি।
বাপ হয়ে জলে ফেলে আন কব কি।।''[১৫]

এরপর কলিঙ্গা ও লাউসেনের বিয়ে সম্পাদন হল। 'মায়ামুন্ড পালা'য় কবি খুব সুচতুর ভাবে কাব্য মধ্যে পতি-ভক্তির সঙ্গে আদিরসের অবতারণা করেছেন। মা তার ছেলে লাউসেনকে ঢেকুরে যেতে দেবে না। কিন্তু পুত্র লাউসেন নাছোর বান্ধা। সে যাবেই। এদিকে মায়ের মনে আশঙ্কার শঙ্কা-মেঘ ঘনিত হয়েছে। মা রঞ্জা পুত্রকে গৃহবন্দি করে রাখার বাসনা পরিত্যাগ করতে পারেনি। মা তার শেষ অস্ত্রটি প্রয়োগ করতে চাইল। চার পুত্রবধূ অমলা, বিমলা, কলিঙ্গা ও কানাড়াকে রঞ্জা বিরলে ডেকে পাঠাল। শাশুড়ির মুখে একথা শোনার পর বধূদের মুখ লাজে লাল হয়ে উঠল। এবং তারা মৃদু মৃদু হাসতে লাগল। এগুলো দেখার পর বড় রাণী কলিঙ্গা নিজের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে।

''প্রবন্ধ করিয়া আগে রাখ প্রাণনাথ।
পতি বিনা যুবতী জনম এঁটোপাত।।''[১৬]

এবার আমরা কলিঙ্গার বীরাঙ্গনা মূর্তিরূপ দেখতে পাই। বীর যোদ্ধা হিসেবে কবি ঘনরাম তাঁর কাব্য মধ্যে কলিঙ্গার বর্ণনা করেছেন। লাউসেন বেঁচে নেই, শোনার পর কলিঙ্গা শাশুড়িকে প্রবোধ দিয়ে যে কথা বলেছে, তাতে কলিঙ্গার মধ্যে দূরদর্শিতার পরিচয় মেলে। কলিঙ্গা বলেছে-

''কলিঙ্গা বলেন বৃথা কর মায়াযোগ।
সুখদুঃখ জন্মমৃত্যু সব কর্ম্মভোগ।।
সংসার অসার সব সার সেই পা।
গোবিন্দ গরিমা গুণ গাও গাও মা।।''[১৭]

'জাগরণ পালা'য় কলিঙ্গা যোদ্ধৃবেশী। স্বামী তার নিজ কর্ম সম্পাদন করতে দূরে গেছেন। এমন সময় যদি মামা শ্বশুর মহামদ এসে শ্বশুর শাশুড়িকে বন্দি করে তাদের সর্বস্ব লুটে নিয়ে যায়, তাহলে তো আর বসে থাকা যায় না। তাই কলিঙ্গা বলছে-

''দূরে গেল প্রাণনাথ প্রভুর পূজায়।
শ্বশুর শাশুড়ি বন্দী দেশ লুটে যায়।।
কলিঙ্গা কহেন সবে করে দশাহীনে।
কত না প্রমাদ পাব প্রাণপতি বিনে।।

কে আছে বান্ধব আর কার মুখ চাব।
শুন বুন কানড়া আপনি সেজে যাব।।''[১৮]

কিন্তু কানড়া বলে আমি থাকতে তোমাকে কিছুতেই যেতে দিব না। এরপর কানড়া দিদি সতীন কলিঙ্গাকে রাহুতের বেশ ধারণ করতে বলেছে। কলিঙ্গা কিন্তু বলেছে 'যখন যেমন দশা সেই সাজ ভাল।''[১৯] এরপর রণংদেহী মূর্তিতে কলিঙ্গা সমর ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হল। মহারাণীকে দেখে মহামদ বলে 'আগে দেখে পরিচয় নে।'। সে দিকে কর্ণপাত না করে কলিঙ্গা বলেছে-

''বল দেখি কোন্ হীনে বেটি বধূ নাই চিনে
কে কোথা করেছে হেন পাপ।।
ধিক ধিক কুলাঙ্গার হাড়ি ডোমে হেন ছার
কুকর্ম্ম করেছে কোথা কে।''[২০]

একথা শোনার পর কুচক্রী মহামদ তথা একালের এবং সেকালের সমাজপতিরা একা রমণীকে পেয়ে যারপর নাই সেই ধরনের কটুক্তি শুনতে হল কলিঙ্গাকে। আজ আমরা সেই মাল্টিমিডিয়ার দৌলতে সেই মধ্যযুগীয় বর্বরোচিত সমাজের নগ্ন চিত্র খুঁজে পাই। আর যদি কোন নারী করে প্রতিবাদ তাহলে তার কপালে নেমে আসে মৃত্যুসম বাণ। এরজন্য দিল্লীর দামিনীর মতো মেয়েকে অকালে চলে যেতে হয়। আবার কাউকে দিদির মান-সম্ভ্রম বাঁচাতে প্রাণ বলি দিতে হয়। কেউবা নিজেকে বাঁচাতে চলন্ত বাস থেকে ঝাঁপ দিতে হয়। আবার এ কাজের জন্য কোন নারী যদি করে প্রতিবাদ তাহলে তার কপালে লেপন করে দেওয়া হয় 'দুশ্চরিত্রা', দেহব্যবসায়ী, গণিকা নারীর মত হাজারো অপবাদ। কেমন করে একলা নারীকে পেয়ে মহামদের মত শঠ চরিত্ররা, তারা শুধু নয়, সকলের লোভাতুর দৃষ্টিতে পরে দৃশ্য দুষণের মতো শব্দ দুষণের জাল পরিয়ে দিল দেখে নেওয়া যাক।

''শুনে পাত্র কোপে জ্বলে হাঁসন হেঁসে নে বলে
সমরে শ্যালীর জানি নে।।
যুবতী যবন মাঝে সেজে আসে কান্ কাজে
বুকেতে নাহিক কুলভয়।
সবে মিলি ধর ধর যে যার বাসনা কর
ও মোর ভাগিনাবধূ নয়।।''[২১]

ক্ষাত্রময়ী কলিঙ্গার ক্ষাত্রতেজ এবার বর্ষিত করেছেন কবি।

''কহে রাণী মহারুষ্ট হেদে রে চন্ডাল দুষ্ট
কি কহিলি কথা পাপরুচি।''[২২]

কলিঙ্গা যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিনী, বীরঙ্গনা-সুলভ তার আচরণ, মনোভাব এবং দক্ষতা। একা রাণী কী-ই বা করবে সকলের কামুক দৃষ্টিতে পড়ে জঠরে লাথি মেরে কলিঙ্গার উপরে চলে অকথ্য অত্যাচার। সে যুগে হলেও কিন্তু বীর রমণীর মতো কলিঙ্গা পুরুষের কামুক-কুটিল চোখের যোগ্য জবাব দিয়েছিল। আবার পতি-প্রাণা কলিঙ্গা স্বামী লাউসেনের যোগ্য সহধর্মিনী হিসেবে কবিরা তাকে অঙ্কন করেছেন।

কানড়া দেবী আশ্রিতা। সে সুন্দরী। সে রণরঙ্গিনী। সে দুঃসাহসিকা। সে বীরাঙ্গনা। যেখানেই কার্যসিদ্ধির জন্য কাউকে বাধা স্বরূপ ভেবেছে; সেখানেই সে তাকে পরাস্ত করছে কখনো কৌশলে, কখনো ছলা-কলার জাল বিস্তার করে। এ কানড়ার মধ্য দিয়ে কবিরা রাঢ়ের জাতীয় সংস্কৃতিকে তুলে ধরেছেন। এ কানড়া পুরুষ প্রধান সমাজের কাছে মাথা হেঁট করবার পাত্রী নয়। তাই দেখা যায় লাউসেন যখন বলে তাকে পরাজিত করতে পারলে তবে তাকে বিবাহ করবে; তখন কানড়া যে উক্তি গুলো বলে তা সমস্ত মধ্যযুগ কেন একালের মানব সমাজেও বিরল নিদর্শন। যে নারী আশৈশব লাউসেনকে পতিরূপে বরণ করেছে আজ যদি লাউসেন তাঁকে অস্বীকার করে তাহলে কী করবে তাঁর মধ্যেও রয়েছে ব্যক্তিত্বময়ী নারীর দৃঢ়চেতা মনোভাব। এমনকী পতিরূপে বরণ করা পাত্রটিকে অর্থাৎ লাউসেনের মাথা কেটে নিতেও তাঁর বুক কাঁপবে না। কানড়া ন্যায় ও কর্তব্যবোধে অনড়। কর্তব্যবোধে যাকে সত্য বলে জেনেছে, মেনেছে, তাকে রক্ষা করার জন্য জীবন বাজি রাখতে দ্বিধা করেনি। এ চরিত্র মধ্যযুগীয় বাতাবরণে একবারে অকৃত্রিম এবং বীর যোদ্ধা লাউসেনের যথার্থ সহধর্মিনী রূপসী কানড়া। নারী চরিত্রের মধ্যে লাউসেন-পত্নী কানড়া পাঠক হৃদয়কে আকর্ষণ করেছে। এই চরিত্রটির মধ্যে কবিরা এক অপূর্ব দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছেন। কানড়া রণ-রঙ্গিনী দুঃসাহসী যোদ্ধা। রাঢ়ের খাঁটি জাতীয় চরিত্র কানড়া। ঘনরামের কাব্যে কানড়ার প্রথম সাক্ষাৎ মেলে ষোড়শ সর্গে। কানড়া হরিপাল তনয়া। গৌড়-রাজের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাবে কানড়া প্রতিবাদ করে বলেছে-

''উচিত বলিতে বাপা লাজ ভয় কি।
কোন বুদ্ধে বুড়া বরে বিলাইবে ঝি।।
কেন কাঁচা কাঞ্চন মিশাতে চাও কাঁচে।
বড় ভাগ্যে ছয়মাস বৎসর বুড়া বাঁচে।।''[২৩]

দেবীর আদেশে কানড়া বলেছে যে জন এক কোপে লোহার গণ্ডাকে এক-কোপে দু'খণ্ড করতে পারবে তার গলায় বরমাল্য দিবে। যখন এই দুঃসাধ্য কাজ কেউ সম্পাদন করতে পারল না তখন সবাই মিলে কানড়াকে সভা মধ্যে ঢেকে এনে তাকে ধর্ষণ করতে চাইছে সমাজের মাথারা। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারী যে পায়ের দাসী, অবলা, তার চিত্রও খুঁজে নিতে আমাদের দেরী হল না। পুরুষ

নামক ব্যক্তিবর্গ মনে করে, নারী হল ভোগের সামগ্রী, সবাই মিলে সভার মধ্যে ডেকে নিয়ে দ্রৌপদীর মত তাকে আজ বিবস্ত্র হতে হবে। এও ঠিক এই সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে কানড়া প্রতিবাদ করেছে। শুধু প্রতিবাদ-ই নয় কানড়া বলেছে-

''বারে বারে না চাই বচন মোর ধর।
এসব বড়াই বাড়া ঘরে গিয়া কর।।
বাড়া বাড়া কহেছ সয়েছি বার তিন।
এবার কহিলে যাবে হয়ে উদাসীন।।
গন্ডার হানিতে যদি না হল যোগ্যতা।
ছলে বলে বিভা করে কার দুটা মাথা।।''[২৪]

লাউসেন লোহার গন্ডাকে দু'খন্ড করার পর, কানড়া লাউসেনকে স্বামীরূপে বরণ করতে চাইল। তাতে গৌড়েশ্বর অপ্রসন্ন হলেন। অবশেষে লাউসেনের সঙ্গে কানড়ার এই চুক্তিতে যুদ্ধ হল যে, লাউসেন যদি কানড়ার হাতে পরাস্থ হয় তাহলে কানড়াকে বিয়ে করতে পারবে। যুদ্ধে কানড়ার হাতে পরাস্থ হয়ে লাউসেন নিজেই বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছে।

কালু ডোমের স্ত্রী লখ্যা বা লখাই। লখাইয়ের বীরত্বের মহিমায় শুধু 'ধর্মমঙ্গল' নয় সমস্ত মধ্যযুগের কাব্যে ভাস্বর। নারীর যে বাঙালী সুলভ মনোভাব তারও পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায় লখাই ডোমের মধ্যে। বাস্তব পক্ষে লখাইয়ের সাহসে, বীরত্বে, কর্তব্যজ্ঞানে, নির্লোভী স্বাজাত্যাভিমানে অত্যন্ত প্রশংসনীয়। পুত্র সকা যুদ্ধে যেতে দ্বিধা করলে মা লখ্যা বলে 'ওরে সাকা হয়ে না মরিলি?' এবং লখাই আরো বলে- 'মোর দুগ্ধ খেয়ে ব্যাটা রণে ভীত হলি?' এর পর পুত্রকে বুঝিয়ে বলে 'যশ কীর্তি বিহীন জীবন অকারণ'। যুদ্ধে পুত্র মারা গেছে, এর থেকে বীর মাতা লখাইয়ের গর্বের আর কী হতে পারে। এই মনোভাবের মধ্যে লখাইয়ের মধ্যে যে অনমনীয় দৃঢ়চেতা বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায় তাতে পুরুষতান্ত্রিক সমাজকে অনেকাংশে ভাবিয়ে তোলে।

লাউসেন যখন রাজ-আদেশে পশ্চিমে উদয় দিতে হাকন্দে চললেন তখন কালু এবং লখাইকে ময়নার ভার দিয়ে গেলেন। অন্নদাতা লাউসেনের এই আদেশ পেয়ে লখা বলেছে-

''লখে বলে প্রাণনাথ করি নিবেদন।
আমারে সঁপিতে চাও ময়না ভুবন।।
অবলা কেবল আমি বল ধরি।''[২৫]

একথা শোনার পর কালু যে কথা বলেছে তাতে রয়েছে লখাইয়ের চরিত্রের ভিতরকার পরিচয়। তার বিবেচনা, কর্তব্যবোধ ও আনুগত্যবোধে সব ধরনের বাঁধা-বিপত্তি এবং দুর্যোগের মধ্যে নিজেকে অবিচল রেখে নিজ কর্তব্য পালন করতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। লখাইয়ের মধ্যে হঠকারিতার বিন্দুমাত্র লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যায় না। যে কোন নারীর মত তাকেও বলতে শোনা যায় এমন কাজ আমি কেমন করে পালন করব। কিন্তু কালু জানে তার স্ত্রী এ বিষয়ে ভীষণ পারদর্শিনী, তাই কালুকে বলতে শোনা যায়-

‘‘কালু বলে ছাড় কলা কোলে কাল অরি।।

তোর যত বল বুদ্ধি মোরে নাই হারা।’’[২৬]

লখাই বলে বাল্যকালের মতো শক্তি নাই। কেন নাই সে কথা বলতে গিয়ে লখাই যা বলেছে তাতে সেকালে নয় একালের সমাজের যে ছবি তা ফুটে উঠেছে। কালুডোম একেরপর এক সন্তান জন্ম দিতে ব্যস্ত থাকার জন্য ‘অবলার বল’ ক্ষয়ে গেছে। খুব স্বাভাবিক আজ তেরো সন্তানের জননী লখাই। কিন্তু পুরুষতান্ত্রিকতার বদ্ধ জলাশয়ে নারীকে পুরুষ শুধুই ভোগের সামগ্রী করে রেখেছে। তারা যে দুর্বল হয়ে পড়তে পারে সে দিকে তাদের বিন্দুমাত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করার মত অবসর নেই। তারা যেন-তেন প্রকারে নারীকে সম্ভোগ করতে পারলেই হল। নারী সে তো অবলা জীব, আর তার গর্ভ সেও তো শুধু সন্তান উৎপাদনের ক্ষেত্র ছাড়া আর কিছু নয়। তাই নারীকে ভোগ করা একদিকে পুরুষ শাসিত সমাজের যেমন একটি অঙ্গ তেমনি সেই ভোগের সামগ্রী থেকে যদি কিছু না পাওয়া যায় তা হলেই যত সব বিপদ। নারী লখাই সে দিক থেকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজকে এবং তার স্বামীকে বিমুখ করেনি। কালু যেমন খুশি তেমনভাবে ভোগ করেছে লখাইকে আর সে একেরপর এক পুরুষতান্ত্রিক সমাজকে সন্তান উপহার দিয়েছে, সেই সন্তান উৎপাদনের কারখানা ঘরে জন্ম নিয়েছে তেরটি সন্তান। তাই খুব স্বাভাবিক তার শক্তির যে অপচয় হয়েছে তাতে বিন্দুমাত্র লখাইকে দোষারোপ দেওয়া যায় না। তবুও সে একা রণংদেহী মূর্তীবেশ ধারণ করল। লখাই একাই চলল যুদ্ধে। বাঁধল যুদ্ধ। এ সমস্ত দেখার পর মহামদ ভয়ে ত্রাহী ত্রাহী। ভয়ঙ্কর যুদ্ধ শেষে লখাই ফিরে এলো। ফিরে এসে দেখে কালু মাতাল হয়ে এখনো শুয়ে আছে। এ দৃশ্য দেখে যে কোন মানুষের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যাবেই। লখাইয়েরও তাই হল। লখাইও তো রক্ত মাংসের মানবী মানুষ। সে এসে এই দৃশ্য দেখার পর কালুকে নানাভাবে ঘুম ভাঙাবার চেষ্টা করল। সেকালের নয় আজকের নারীর মত সেও জানে স্বামীকে আঘাত করা বড় অপরাধ তাই সে বিধাতাকে সাক্ষী রেখে বলেছে-

‘‘নাড়াচাড়া দিয়ে ডাকে তবু নাহি নড়ে।

লখে বলে প্রাণনাথে চিয়াব চাপড়ে।।

বিধি বিষ্ণু শঙ্কর তোমারা থাক সাক্ষী।

চাপড়ে চিয়াব পতি না হব পাতকী।।''[২৭]

ঘনরামের 'আখড়া পালা'য় দেবী চন্ডী লাউসেনকে মুগ্ধ করার জন্য পতিতা বৃত্তি গ্রহণ করতে পিছুপা হয়নি। দেবী ভবানী লাউসেনের বলিষ্ঠ দৈহিক গঠন দেখে মুগ্ধ হয়ে লাউসেনকে নিজের যৌবন বিলিয়ে দেবার জন্য নানা সাধ্য-সাধনা করেছেন। দেবী লাউসেনের রূপের মোহে আবিষ্ট হয়েছে। দেবী নানা ছলে-বলে কলা-কৌশলে লাউসেনের কামুক সত্তাকে জাগ্রত করতে চেয়েছেন। সুচতুরা দেবী কথার জালে লাউসেনকে মুগ্ধ করতে চেয়েছেন। নরসিংহ বসু তো লাস্যময়ী দেবীকে ছলনা করার ফাঁকে নিজের যৌবন ধনকে বিলিয়ে দিতে চেয়েছেন। সুযোগ বুঝে দেবীকে দিয়ে করালেন-

''লাউসেন ভুলাতে লাবণ্য নানা রঙ্গ।

খসায়ে বুকের বাস দেখাইল অঙ্গ।।''[২৮]

দেবী আজ মর্ত্যের মানবী। লাউসেনের মনকে টলানের জন্য দেবী বহুজনের উদাহরণ টেনে এনেছেন। যেমন রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ইত্যাদির কথা বলেছেন। তিনি বললেন অতীতের মহৎ ব্যক্তিরা, রাজা, মুনি ঋষি অনেকেই পর নারীর ভোগাকাঙ্খার জন্য মত্ত ছিলেন, তাতে তাঁদের মহিমায় এতটুকু কালিমা লিপ্ত হয়নি। পুরাণের প্রসঙ্গ টেনে তিনি আরও বললেন পৌরাণিক বহু নারী অসতী হয়েও তাঁরা অমরত্বের অধিকারিণী। এই প্রসঙ্গে তিনি নিয়ে এসেছেন প্রাচীনকালের বেশ্যাবৃত্তির কথা। যেমন-

''স্বর্গের যে সব বেশ্যা ভোগ করে কে।

তুমি মাত্র বুঝ মেনে নাহি বুঝে সে।।

গণে দিতে পারি রায় গগনের তারা।

সবার বারতা জানি কিছু নাই হারা।।

অতএব ওসব কথা পুঁতে রাখ পাঁকে।

যতকাল জগতে যৌবনদশা থাকে।।''[২৯]

লাউসেনের চারিত্রিক দৃঢ়তায় মুগ্ধ হয়েছেন দেবী। দেবী তাঁর নিজ বেশ দেখিয়ে লাউসেনকে আশীর্বাদ করলেন এবং বর দিলেন। দেবী যেভাবে গণিকাবেশে কথা বলেছেন এবং যে রকম আচার ব্যবহার কাম চঞ্চলা রূপের বাহার-মোহিনী দেখিয়েছেন, তাতে বলতে হয় এ দেবী, দেবী নয়, এ একেবারে আজকের মানব সমাজের অতি সুচতুরা, সুশিক্ষিতা এক গণিকা।

এ কাব্যের মধ্যে এক ঝাঁক পতিতা রমণী রয়েছে। এদের মধ্যে নয়ানী, সুরিক্ষা, সনকা, গুরিক্ষা, ভাজনবুড়ী আরো অনেকে ধর্মমঙ্গলের 'জামতি পালায়' লক্ষ করা যায়। জামতি নগরে

নারীদের স্থান সবার উপরে। এ নারীরা সবলা আর পুরুষ হল দুর্বল। এরা গনিকা নয়। কিন্তু পর-পুরুষের সঙ্গে কামাচার করতেই এদের আগ্রহ। এ কাব্যের কবি-বর্গ জামতি নগরের নারীদের সুনিপুন ভাবে অঙ্কন করেছেন। যেখানে পুরুষের একাধিক বিবাহে বাধা নেই, একাধিক নারী সম্ভোগ করে বেড়ায়, আবার সেই পুরুষেরা-ই উঁচু তলার বাসিন্দা হয়ে কাজ করে। আর সেখানে যদি নারীর পর-পুরুষে আসক্তি হয় তাহলেই তারা সমাজ-চ্যুত হয়ে যায়। এমতাবস্থায় ধর্মমঙ্গলের কবিরা সমাজকে তোয়াক্কা না করে নারী-পুরুষের সমস্ত কিছুতেই সমানাধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এ ধরনের পালার সংযোজন করেছেন।

নয়ানী শিবাই দত্তের স্ত্রী। তিন ছেলের মা নয়ানীর বয়স ষোল বৎসর। এ নারী বহুচারিণী। নারীরা যে রূপ ও বীরত্বের মোহে আবিষ্ট সে কথা ধর্মমঙ্গলের কবিদের অজানা ছিল না। তাই কবিরা যত্ন সহকারে মনস্তত্ত্বের গভীর তলদেশে অবগাহন করে অন্যান্য নারী চরিত্রের মত নয়ানীর চরিত্রটিকে এঁকেছেন। 'পরের পুরুষ ভ্রষ্টা ভুলাবার জন্য' নয়ানী সিদ্ধ-হস্থা। মদন বাণে নয়ানী যখন জ্বলে উঠে তখন 'বসিয়া ভক্ষণ করে কর্পূর তাম্বুলী।' রূপবান লাউসেনকে দেখে নারীসুলভ মায়ায়, নানা ছলাকলায় নয়ানী তাকে ভোলাতে চেয়েছে। নয়ানী ঘর থেকে বের হওয়া মাত্র তার পিছুপিছু তার-ই শিশু সন্তানটি কেঁদে কেঁদে আসতে লাগল। কিন্তু 'মদনে মাতিয়া মাগী ফিরে নাহি চায়।' আর তার শিশু সন্তানটি দৌড়ে মা নয়ানীর কাপড়ের আঁচল ধরে। কামোন্মাদনে মাতোয়ারা হয়ে নয়ানী ফিরে তাকায় না শিশুটির দিকে। বরং বলতে লাগে-

''কোপে তাপে বলে মাগী গালে মারি চড়।।
ফিরে যারে সাপেখেকো বাপের মাথা খাগা।
হেথা কি আসিস্ মোর আশে দিতে দাগা।।

*** *** ***

পাগল পুরুষ যত রূপ হেরে বাটে।
বিকালো সবার মন যৌবনের হাটে।।''[৩০]

শুধু এইটুকু বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হননি কবিরা। ঘনরাম তো একটু এগিয়ে লিখলেন-

''বিচলিত করে বায়ে কুচের বসন।
লাসবেশ লাবণ্যে হরিতে চায় মন।।
নাভিদেশ দেখায় উদরবস্ত্র ঝাড়ে।''[৩১]

লাউসেন এতকিছু দেখার পরও নিজেকে নিজে বিচলিত হতে দেয়নি। এটা বোধ হয় একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। যেকোন পুরুষ-ই এই নিতম্বী বেশধারী নারীর নাভীদেশ দেখে ক্ষণিকের জন্য

বিচলিত হবেন, লাউসেনের বেলায় কবিরা একটু বেশী সংযত করে রেখেছেন ধর্মসেবক লাউসেনকে। আবার এও হতে পারে ধর্মবীর লাউসেনকে নারীর প্রলোভনের দিকে এগিয়ে দিলে পুরুষশাসিত সমাজপতিদের মাথা কাটা যাবে। নারীর কামবহ্নিকে যদি কোন পুরুষ নিভাতে না পারে সেকালের মত একালেও দেখা যায় হাজার হাজার ঘর-ভাঙ্গার দৃশ্য। এই জন্য কবিরা এভাবে পুরুষালি মনোভাবকে কাজে লাগিয়েছেন। এতকিছু করার পর যখন লাউসেনকে তার হাতের নাগালের মধ্যে আনতে অপরাগ হল, তখন নয়ানী প্রতিহিংসা পরায়না হয়ে উঠল। পুরুষ পাগলী নয়ানী আপন সন্তানকে কুয়োর মধ্যে ডুবিয়ে মেরে দিয়ে দায় চাপাল লাউসেনের উপর।

গোলাহাট রাজ্যখানি বেশ্যাপল্লী। সুরিক্ষা গোলাহাট রাজ্যের প্রধান। সুরিক্ষার সঙ্গী-সাথীরা পুরুষ শিকারে ব্যস্ত। সুরিক্ষার এক সঙ্গী পরিচারিকা গুরিক্ষা বাজারে পানের পসরা নিয়ে বসে আছে, সে পুরুষ শিকারী। নানা প্রলোভন দেখিয়ে যেকোন পুরুষকে বশে আনবার জন্য ফন্দি আঁটে। আর শিকারীকে পাওয়া মাত্র সে নিয়ে আসে সুরিক্ষার কাছে। সুরিক্ষা বহু পুরুষকে বশ করে তার নিজের করায়ত্ত করে রাখে। সে বহু নাগর-পুরুষকে বন্দি করে তার অধীনে রেখেছে। তার বেতনভুক কোন চাকর-বাকর নেই, কিন্তু তার রূপের মোহে পাগল হারা হয়ে বহু পুরুষ নিজে স্বেচ্ছাবৃত দাসে পরিণত হয়েছে। এই স্বেচ্ছাবৃত পুরুষ-দাস সুরিক্ষার আজ্ঞাবাহী। কখন তারা করছে সুরিক্ষার রক্ষী-বাহিনির কাজ, কখন তারা গরু-ছাগলের চড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

ভাজন বুড়ি এক বৃদ্ধা বেশ্যা ভিখারিনী। তার যৌবন চলে গেছে। বুড়ীর তিনকাল গিয়ে এখন একাল আছে পড়ে। তবুও বুড়ীর মনে জাগে কামানলের বহ্নিজ্বালা। বুড়ী দেখে মালাকার নারী অনুপম দুটি যুবককে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে তাই দেখে বুড়ীর মনে বিকৃত কামানল জেগে উঠেছে। আজ 'নিরখিয়া নাগরে পাগল হলো বুড়ী।' বুড়ীর কাছে মালিনী কড়ি চেয়েছে দশ বুড়ি। কিন্তু বুড়ী তো ভিখারিনী সে কেমন করে কড়ি দেবে। বুড়ীর কামুক লোভ যে আজ নিবারণ হওয়ার নয়, মালিনী বলল 'পাঁচ গন্ডা ছাড়িনু মাউই'। বেশ তাতেই বুড়ী রাজী হল। এরপর বুড়ী নানাভাবে নিজেকে সাজিয়ে নিল। আজ যে বুড়ী নাগর ধরতে চলল। তা আবার পাঁচ গন্ডা কড়ির বিনিময়ে। বুড়ীর তো নিত্য নিত্য খাবারই জোটে না, সে কীনা পাঁচ গন্ডা কড়ি দিয়ে নাগর ভোলানোর জন্য এসেছে। বেশ তাই হলো এখন বুড়ী নাগরের নিকটে অভিলাষী হয়ে এসেছে। আসার পর বলতে লাগল, তোমরা হলে 'রঞ্জাবতীর ঝিয়ারীর বেটা।' তোমরা অন্য ঘরে কেন উঠেছ? সে যা হবার তা তো হয়ে গেছে, অতএব-

''না জেনে যা হবার হ'ল এখন এস নাতি।
শিখে যাবে রতিরস রয়ে এক রাতি।।''[৩২]

কিন্তু এরকম বুড়িকে দেখে তো কোন যুবা পুরুষ তার সঙ্গে তো আর সহবাস করতে যাবে না। লাউসেন এবং কর্পূরও ঠিক তাই বলেছে। বুড়ীকে ''সকল ছাড়িয়া কর গোবিন্দ ভরসা।।''[৩৩]-র কথা বলেছে।

কবিরা কী কাজ করাতে চেয়েছেন? দেহলোভী, কামাতুরা ভাজন বুড়ীকে আজ সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে নাগর ধরতে পাঠালেন? সে তো ঠিক এমনটি না করলে যে তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার কথা অসম্পূর্ণ থেকে যেত। কীভাবে একজন ভিখারিণী তার সর্বস্ব বিক্রি করে দিয়ে আজ নাগর ধরতে গেল। এর মধ্যে দিয়ে ভিখারিণীর মনস্তাত্ত্বিক দিকটি খুব সুন্দরভাবে চিত্রিত। সে তো ভিখারী। সে সহায় সম্বল হীনা। আজ তো যা ছিল নাগরের লোভে সব বিকিয়ে দিয়েছে। কবিরা সুচতুর শিল্পি তাঁরা একটু রসিকতার মাধ্যমে ভাজন বুড়ীর আসল চরিত্রটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। বুড়ী তো জানে তার তিনকাল চলে গেছে, বাকি আছে এককাল। এই শেষকালে গিয়ে বুড়ী খাবে কী? তাকে খাওয়াবে কে? তাকে দেখবে কে? কেউ না। তাই আজ ভাজন বুড়ী ধর্মপুত্র লাউসেনকে ধরতে গিয়েছে তার ভাবীকালের কথাকে মাথায় রেখে। লাউসেনের যদি ক্ষণিক দয়া হয় তবে তার বেঁচে থাকার সম্পদ পেয়ে যাবে।

ধর্মমঙ্গলের কবিরা অতি সুকৌশলে আধুনিক নারীর মনস্তত্ত্ববোধ জাগ্রত করেছেন। এই কবিরা তো সেকালের কবি বলে মনে হয় না, মনে হয় এ কবিরা আজকের অর্থাৎ একবিংশ শতাব্দীর কবি। মনে হয় আজকের কবিরা তাঁদের যশ-খ্যাতির খাতিরে এ ধরনের ভাষায় কাব্য, কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক লিখতে দ্বিধাবোধ করেন। অথচ ধর্মমঙ্গলের কবিরা তাঁদের কলমের লেখনীতে কিভাবে সে যুগে দাঁড়িয়ে নারীর স্বাধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার অভীপ্সায় মেতে উঠলেন তা ভাবলে অবাক হতে হয়। এর থেকে বলা যায়, যে প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগের সমস্ত জায়গাতেই পতিতা বৃত্তির সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু কবিরা এ হেন চিত্র কেন অঙ্কন করলেন? তারা কি এ ধরনের চিত্র আঁকতে ভালবাসতেন? না কি অন্য কিছু? আসল কথা কবিরা এই পতিতা বৃত্তির আড়ালে মধ্যযুগের ধর্মমঙ্গলে নারীর স্বাধীন-চেতা মনোভাবকে এবং ব্যক্তিত্বময়ী সত্ত্বাকে তুলে ধরেছেন। যদি তারা এই সমস্ত নারীদের সমাজ-গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখতেন তবে তো আর এ ধরনের কথা এমনকি তাদের আপন চাহিদার কথা বলতে পারতেন না। তাই কবিরা এ ধরনের রূপকের আড়ালে, তাঁদের নারী চরিত্রকে সমাজ থেকে বিচ্যুতি ঘটিয়ে নারীর আপন ভাগ্য, আপন অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। কবিরা তো দেখেছেন তাঁর সমকালীন সমাজকে, দেখেছেন সে কালের নারীদের হতভাগ্য জীবনকে। আর যখন-ই কেউ রুখে দাঁড়াতে চেয়েছে, তখন-ই পুরুষ-শাসিত সমাজ তাদের দিকে এসেছে ধেয়ে। তাদের আপন অধিকারকে লুঠ করে নিয়েছে। কখনো তাদেরকে চিরতরে

পাঠিয়ে দিয়েছে পরলোকে। তাই একাব্যের কবিরা অতি সচেতন ভাবে এই ধরনের পতিতা-বৃত্তিকে টেনে এনেছেন। কারণ তারা পতিতা, তারা যা খুশি তাই বলতে পারে, যা কিছু তা করতে পারে, তারা সমাজ নামক পদার্থকে বুড়ো আঙ্গুল দেখাতে ভয় পায় না। প্রত্যেক কবি-ই তো সচেতন শিল্পী, তাঁরা সমাজকে দেখে, আর সমাজ-প্রতিবিম্বকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাঁদের সাহিত্যে তুলে ধরে নিজ হৃদয়-আর্তিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

শিবায়ন: শিবায়ন কাব্যধারা মঙ্গল কাব্য-শাখার একটি উপশাখা।

> ‘‘*** গাজন, ছড়া ও পালার মধ্য দিয়া নানারূপ পরিবত্তর্নের পর শিবঠাকুরের কাহিনী অবশেষে আখ্যান-কাব্যের রূপ ধারণ করিয়াছে। যে সব কবি এই সকল আখ্যান-কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে রামকৃষ্ণ রায় কবিচন্দ্র ও রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য এই দুইজন কবির শিবায়ন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।’’[৩৪]

শিবায়ন কাব্যের মধ্যে তৎকালীন সমাজের প্রকৃত অবস্থা প্রতিফলিত হয়েছে। শিবায়নের কবিগণের মধ্যে রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য যথার্থ সুরুচির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর অঙ্কিত নারী চরিত্রগুলির গায়ে লেগে আছে সোদা মাটির গন্ধ। গ্রামের সরলতা-সজীবতা শিবায়ন কাব্যের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে আছে। আর একাব্যের শিব এবং পার্বতীর বিয়ে সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পর তাঁরা চলে আসেন কৈলাসে। শিবের সংসারে দারিদ্রতা নিত্য সঙ্গী। শিব ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন করে কোনপ্রকারে সংসার চালিয়ে যাচ্ছেন। এখানে পার্বতী ধৈর্য্যশীলা রমণী। ভিক্ষা করে স্বামী যা নিয়ে আসেন, তা অতি যত্ন সহকারে রান্না করে স্বামী ও পুত্রদের ভোজন করান। পার্বতী নিজে না খেয়ে স্বামী এবং পুত্রদের খাওয়ান। ফলস্বরূপ গৌরীর দেহ-লাবণ্য ক্রমান্বয়ে অন্তর্হিত হয়ে গেল। গুণবতী গৌরীর পরামর্শে শিব ভিক্ষাবৃত্তি ত্যাগ করে চাষের কাজে নিজেকে নিযুক্ত করলেন। প্রথমে শিব ইন্দ্রের কাছ থেকে চাষ-করার জন্য জমির পাট্টা গ্রহণ করলেন। তারপর একে একে চাষাবাদের ফলে গৌরীর গৃহে অন্নাভাব থাকল না। কিন্তু অন্নাভাব না থাকলেও গৌরীর জীবনে শান্তি ফিরে এল না। কারণ দেবাদিদেব মহাদেব মর্ত্য-ভূমিতে চাষের কাজে নিজেকে এমন ভাবে নিযুক্ত করেছেন, যে কৈলাসে যাওয়ার কথা তিনি ভুলে গিয়েছেন। মর্ত্যলোকের কিছু নারীর সঙ্গ পেয়ে তিনি নিজের স্ত্রী গৌরীর কথাও ভুলে গিয়েছেন। এমতাবস্থায় গৌরীর জীবনে গৃহ-শান্তির কিছুই থাকল না। তাই বাধ্য হয়ে দেবী গৌরী স্বামীকে কৈলাসে ফিরিয়ে আনার জন্য নানা পন্থা অবলম্বন করলেন। প্রথমে গৌরী প্রেরণ করলেন উঙানি মশা, দ্বিতীয়বার মাছি ও ডাঁশ, তৃতীয়বার বহু মশক এবং চতুর্থবার প্রেরণ করলেন বহু সংখ্যক জোঁক। কিন্তু কোন কিছুতে কোন কাজ হল না। শিব মর্ত্যলোকে চাষের কাজে নিজেকে লিপ্ত করেই রাখলেন।

এবার দেবী পার্বতী বাধ্য হয়ে, স্বামী-সঙ্গ সুখকে পাওয়ার আশায় নিজেই বাগ্‌দিনীর বেশ ধারণ করে চলে এলেন মর্ত্যে। এ বাগ্‌দিনী রূপ-লাবণ্যবতী। শিব চললেন কোঁচিনী পাড়ায়। গিয়ে দেখেন লাবণ্য-ময়ী ছদ্মবেশী গৌরীকে। গৌরীর রূপের মোহে পাগল-হারা হয়ে শিবের কাম-চঞ্চলতা ক্রমান্বয়ে বেড়ে গেল। এ বাগ্‌দিনীর পরিচয়ে পাই-

''হাস্যা হাস্যা ঘেস্যা ঘেস্যা ছুতে যায় অঙ্গ।
বাগদিনী বলে আই মা এ আর কি রঙ্গ।।
বুড়া সুড়া মনুষ্যা হয়্যা কেমন কর সয়্যা।
মন মজিল পারা মাঠে পায়্যা পরের মায়্যা।।
দেবদেব বলে মোরে দয়া কর সই।
বাগদিনী বলে আমি তেমন মায়্যা নই।।
আপনাকে আঁট নাই পরের মাগ চাও।
এত যদি আম্বা আছে ঘর কেন না যাও।।''[৩৫]

একথা ঠিক দেবী পার্বতী নিজ-স্বামীকে ঘরে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাগ্‌দিনী বেশে শিবের শয্যক্ষেত্রে এসেছেন। শিব এই বাগ্‌দিনীকে চিনতে পারেননি। মর্ত্য-লোকের মানুষের মত শিব আজ বাগ্‌দিনীকে ভোগ করতে চেয়েছেন। বাগ্‌দিনীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে আলিঙ্গণ করতে চেয়েছেন। এদিকে স্বামী দেবতার মান যাতে খর্ব না হয়, তাই পার্বতী গায়ের কাদা ধুয়ে নেবার জন্য ছল করে কৈলাসে চলে এসেছেন। কিন্তু দেবীর ছদ্মবেশিনী রূপে পাগল-হারা হয়ে মহাদেব বাগ্‌দিনীকে দিয়েছেন একটি অঙ্গুরী। এখানে দেবী পার্বতীর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতেই হবে। এই অঙ্গুরী প্রমাণ-স্বরূপ রেখে তিনি তো চলে গেলেন কৈলাসে। শিব আজ নিজেকে স্থির রাখতে না পেরে চলে এসেছেন কৈলাসে। কিন্তু দেবী পার্বতী তাঁরই প্রদত্ত বাগ্‌দিনীকে দেওয়া অঙ্গুরী দেখিয়ে গৃহে প্রবেশ করতে দিলেন না। এবং কলহ-প্রিয় নারদের পরামর্শে পার্বতী শিবের কাছে শঙ্খ চাইলে, শিব দিতে পারেননি। তাই দেবী পার্বতী স্বামীর এহেন আচরণের জন্য প্রতিবাদ করে নিজ পিত্রালয়ে চলে গেলেন। শিব পড়লেন কঠিন বিপদে। তারপর নারদ মুণির পরামর্শে শিব নিজে শঙ্খের ঝুলি নিয়ে গিরিরাজপুরে উপস্থিত হয়ে শিবানীর বামহস্তে এবং দক্ষিণ হস্তে শঙ্খ পরিয়ে দেওয়ার পর স্বামী স্ত্রীর মধ্যেকার মান-অভিমান দূরীভূত হয়ে গেলে তাঁরা সপরিবারে কৈলাসে নিজ গৃহে গিয়ে প্রত্যাবর্তন করেছেন। একাব্যে পার্বতী আদর্শ স্বামী প্রেমে মাতোয়ারা। স্বামী শিবকে কেউ দোষারোপ করুক তিনি তা কোনভাবে মেনে নিতে পারেননি। যদিও ক্ষণিকের জন্য ভুলে গিয়েছিলেন যে, তিনি শিবের ঘরের ঘরণী, শিবানী কিন্তু

বাগ্‌দিনীবেশী গৌরী তাঁর স্বীয়-কর্মটিকে নিজেই সমালোচিত করে কৈলাসে ফিরে এসেছেন। এ পার্বতী আমাদের বাঙালি ঘরের সু-নিপুনা, আদর্শবতী নারী, গৃহলক্ষ্মী।

অন্নদামঙ্গল: ভারতচন্দ্র রায়ের অন্নদামঙ্গল কাব্য, মঙ্গলকাব্য ধারায় এক অভিনব সংযোজন। এ কাব্যখানি মঙ্গলকাব্যের নিয়ম-নীতির মধ্যে আবদ্ধ হলেও এর সর্বাঙ্গে রয়েছে অভিনবত্বের ডালি। অন্নদামঙ্গল কাব্যের মধ্যে তৎকালীন সমাজের প্রকৃত অবস্থা প্রতিফলিত হয়েছে। অন্নদামঙ্গল কাব্য তিনটি খন্ডে বিন্যস্ত। প্রথম খন্ড 'অন্নদা-মঙ্গল' বা 'অন্নপূর্ণা-মঙ্গল', দ্বিতীয় খন্ড 'কালিকামঙ্গল' বা 'বিদ্যাসুন্দর' এবং তৃতীয় খন্ড 'মানসিংহ'। ''ভারতচন্দ্র প্রাচীন বঙ্গভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ শব্দশিল্পী'' শব্দ-কুশলী ভারতচন্দ্রের শব্দের মোহময়ী জালে সকলে মুগ্ধ। রাজকীয় ভঙ্গীতে ভারতচন্দ্র তাঁর নারী চরিত্রগুলিকে সৃজন করেছেন। নারীর ব্যক্তিস্বাধীনতা একাব্যের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রতিষ্ঠিত। এই চরিত্র-সৃজন করতে গিয়ে তিনি যেমন পুরাণের দ্বারস্থ হয়েছেন, তেমনি তিনি মুকুন্দ চক্রবর্তীর চন্ডীমঙ্গলকে করেছেন অনুসরণ।

অন্নদামঙ্গল কাব্যের প্রধান চরিত্র দেবী অন্নদা। এই অন্নদা প্রথমে সতী, তারপর পর্বত-দুহিতা উমা এবং পার্বতী, পরবর্তীকালে কাশীধামের আরাধ্যা দেবী অন্নদা। অন্নদার খন্ড-চিত্র গুলি খুঁজে পাই সতীর দক্ষালয়ে গমন, তার দেহত্যাগ, এরপর উমার তপস্যা, স্বামী শিবের ঘরণী হয়ে স্বামী স্ত্রীর কোন্দল, তারপর দেবী অন্নপূর্ণা রূপে কাশীতে প্রবেশ, ব্যাসদেবকে ছলনা এবং শেষে অন্নদা ও ঈশ্বরী পাটনীর কথোপকথনের পর ভবানন্দ মজুমদারের গৃহে গমন।

সতী যেতে চাইলেন দক্ষগৃহে কিন্তু শিবকে নিমন্ত্রিত করা হয়নি বলে, শিব যেতে রাজি হলেন না, কিন্তু সতী পিত্রালয়ে যাওয়ার জন্য দশমহাবিদ্যা রূপ ধারণ করলেন। নিমন্ত্রণ না পেয়েও মেয়ে হয়ে সতী পিতৃ-গৃহে যাওয়ার মধ্যে রয়েছে বঙ্গ-রমণীদের বঙ্গ-অভীপ্সা। এরপর সতী চলে এলেন পিতার বাসভবনে। এসে পিতার মুখে স্বামী শিবের নিন্দা শুনে নিজেকে স্থির রাখতে না পেরে পিতাকে অভিশাপ দিয়ে নিজে প্রাণত্যাগ করলেন। যেকোন বঙ্গ-রমণীর মত সতী তাঁর স্বামীর নিন্দাকে কোনভাবে মেনে নিতে পারেননি। সামান্য কিছু শব্দ-জালে সতী চরিত্রের মাধ্যমে আপামর বাঙালি নারীর চরিত্রকে ভারতচন্দ্র তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন।

এবার দেখা যায় দরিদ্র-ঘরের স্বামী স্ত্রীর কলহের চিত্র। শিব-পার্বতীর ঘরের চিত্র আমাদের চোখে দেখা বাঙালি ঘরের নিত্য দিনের ছবি। কলহ-পরায়ন চিত্রের মধ্যে স্বামী দেবতাকে পার্বতী ছেড়ে কথা বলেননি। একে অন্যের ঘাড়ে দারিদ্রতার দায় চাপিয়ে দিলে কেউই ছাড়বার পাত্র বা পাত্রী নন। কৈলাসপতি শিবের অভাবের সংসার, 'দিন আন্তে পান্তা ফুরায়'। দিনে দিনে প্রচুর ভিক্ষা করে নিয়ে এলেও শিব একদিনও পেট পুরে খেতে পান না। তাই মনের দুঃখে বলে ফেলেন-

''আর সবে ভোগ করে কত মত সুখ। কপালে আগুন মোর না ঘুচিল দুঃখ।।
নীচ লোকে উচ্চ ভাষে সহিতে না পারি। ভিক্ষা মাগি নাম হৈল শঙ্কর ভিখারী।।''[৩৬]

শিবের আরো দুঃখের কারণ-

''বিধাতার লিখন কাহার সাধ্য খন্ডি। গৃহিণী ভাগ্যের মত পাইয়াছি চন্ডী।।
সর্বদা কোন্দল বাজে কথায় কথায়। রস কথা কহিতে বিরস হয়ে যায়।।''[৩৭]

দারিদ্রই কোন্দলকে বাড়িয়ে তোলে। শিবের ঘরেও তাই হল। কোন্দল আজ চরম আকার ধারণ করেছে। শিব বলে ফেলেন-

''পরস্পরা পরস্পর শুনি এই সূত্র। স্ত্রী ভাগ্যে ধন পুরুষ ভাগ্যে পুত্র।।''[৩৮]

একথা শোনার পর যে কোন নারীর মত গৌরী রেগে আগুন। কারণ তিনি-ই তো নানা কষ্টে সংসার চালান, তারপর আবার এই গঞ্জনা। স্বামীর এই গঞ্জনায় নিজেকে স্থির রাখতে না পেরে এতদিনের পুঞ্জিত ক্ষোভকে গৌরী এক লহমায় বলে দিলেন-

''অলক্ষণা সুলক্ষণা যে হই সে হই। মোর আসিবার পূর্ব্বকালী ধন কই।।
গিয়াছিলে বুড়াটি যখন বর হয়ে। গিয়াছিলে মোর তরে কত ধন লয়ে।।''[৩৯]

এই কলহ বাঙালির সংসারের নিত্যদিনের ছবি। নিস্কর্মা উদাসীন শিব সারা দিন নেশা করে পড়ে থাকে, অন্যদিকে গৌরী ছেলে-পিলের মুখে দু-মুঠো খাবার ঠিক মত দিতে পারছেন না বলে, গৌরীর দুঃখের অন্ত নেই। বাউন্ডুলে প্রকৃতির স্বামীকে নিয়ে গৌরী কি করবেন ভেবে-চিন্তে, কুল-কিনারা না পেয়ে ছেলে-পিলে নিয়ে পিত্রালয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে, সখী জয়া এসে গৌরীকে যে উপদেশ দিয়েছেন তাতে তৎকালীন বঙ্গ-সমাজের প্রকৃত চিত্র আমাদের সম্মুখে ফুটে ওঠে।

''জননীর আশে : যাবে পিতৃবাসে: ভাজে দিবে সদা তাড়া।
বাপে না জিজ্ঞাসে: মায়ে না সম্ভাষে: যদি দেখে লক্ষ্মীছাড়া।।''[৪০]

অন্নদামঙ্গল কাব্যের লৌকিক কাহিনি অংশ অতি সংক্ষিপ্ত। এখানে দেবী অন্নদা হরি হোড়ের প্রতি অনেক বেশী দয়াবশত রূপ দেখিয়েছেন। হরি হোড়ের প্রতি অহেতুক দয়া, তাকে বরদান এবং পরে অন্যায়ভাবে থাকে পরিত্যাগ করে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দের গৃহে যাত্রা বর্ণনার মধ্যে পক্ষপাতদুষ্টের পরিচয় মেলে। প্রিয় সখী-

''জয়ারে কহিলা দেবী হাসিয়া হাসিয়া। এ গ্রামে কে বড় দুঃখী দেখহ ভাবিয়া।।
তার ঘরে জন্মিবে আমার বসুন্ধর। বড় সুখী করিব পশ্চাতে দিয়া বর।।''[৪১]

তাঁরা কী দেখলেন-

''হেন কালে এক রামা স্নান করি যায়। তৈল বিনা চুলে জটা খড়ি উড়ে গায়।।
অন্ন বিনা কলেবরে অস্থি চর্ম সার। গোঁয়ে লোকে দিয়াছে পদ্মিনী নাম তার।।

*** *** ***

ঘুঁটে কুড়াইয়া স্বামী বেচেন বাজারে। যে পান খাইতে তাহা না আঁটে তাঁহারে।।''[৪২]

এই অত-দরিদ্র নারীটিকে দেখে দেবীর দয়া হল। এরপর দেবী এই দরিদ্রার ঘরে স্বর্গভ্রষ্ট বসুন্ধর করলেন জন্ম গ্রহণ। মর্ত্যে নাম হল হরি হোড়। আর হরি হোড় ক্রমে-ক্রমে বড় উঠল-

''বনে মাঠে বেড়াইয়া: কাট ঘুঁটে কুড়াইয়া: বেচিয়া পোষয়ে বাপু মায়ে।''[৪৩]

একদিন দেবী নিজে ছলনায় হলেন ব্রতী-

''কাট খড় জড়াইয়া: সব ঘুঁটে কুড়াইয়া: রাখিলেন ভরি এক ঝুড়ি।।''[৪৪]

দেবী অন্নদার ছলনায় হরি হোড় সে-দিন আর ঘুঁটে পেল না। আর দেবী তাঁর মায়ামোহিনীবেশে হরি হোড়কে বললেন যদি তাঁর কাঠের বোঝা তাঁর বাড়িতে পৌছিয়ে দেয় তাহলে কাঠের অর্ধভাগ হরি হোড়কে দিয়ে দেবেন।

''বাতে কুঁজে বেঁকে বেঁকে: লড়ী ধরে থেকে থেকে: আগে চলিলেন বুড়ী।''[৪৫]

এরপর দেবী চলে এলেন হরি-হোড়েরর বাড়িতে। এখানে এসে দেবী বললেন হরি হোড়ের বাড়িতে তিনি কালাতিপাত করবেন। এরপর একজন অতি সাধারণ গৃহস্থ হিসেবে বলতে লাগলেন-

''ভাঙ্গা কুঁড়ে ছাওয়া পাতে: বৃদ্ধ পিতা মাতা তাতে: ঠাঁই নাহি হয় চারি জনে।।
অতিথি আপনি হবে: উপোসী কেমনে রবে: অন্নের সংযোগ মোর নাই।''[৪৬]

এই কথা শোনা মাত্র দেবী অন্নদা যেন করুণায় বিগলিত হয়ে বলতে লাগলেন-

''গৃহিণীর পাপ পুণ্যে ঘর থাকে মজে। সেই সে গৃহিণী যেই অন্নপূর্ণা ভজে।।''[৪৭]

এরপর দেবী অন্নপূর্ণার প্রতি তাদের ভক্তি উদ্রেক তো হবেই-

''বুড়ীটি কহেন রামা শুন মন দিয়া। অন্নপূর্ণা নাম লয়ে হাঁড়ী পার গিয়া।।
হাঁড়ীভরা অন্ন আর ব্যঞ্জন পাইবে। কোন কালে খাও নাই এমন খাইবে।।''[৪৮]

দর্শক-পাঠকদের চমক লাগাবার জন্য-

''ঘুঁটে হৈল হেমঘুঁটে দেবীর পরশে। লোহা যেন হেম হয় পরশি পরশে।।''[৪৯]

হরি হোড় একেবারে সাধারণ মানুষ, দেবীর ছলনাময়ী রূপে খানিকাংশে ভয় পেলেও, নিজের বিচার-বুদ্ধিকে হারিয়ে ফেলেননি।-

''ঘুঁটে দেখি হেমঘুঁটে হরিহোড়ে ভয়। এ কি দেখি অপরূপ ঘুঁটে সোনা হয়।।
কেমন দেবতা মেনে বুড়ী ঠাকুরাণী। জাগিতে স্বপন কিবা বাজি অনুমানি।।
তপস্যা কি আছে যে দেবতা দেখা দিবে। ভাগ্যগুণে বুঝি কোনো বিপদ ঘটিবে।।''[৫০]

এবার দেবী নিজেই নিজের পরিচয় দিলেন। দেবীর বরে হরি হোড় ধন-ধান্যে ভরপুর হলেন। দেবী অন্নদার ঘুঁটে-কুড়ানীর রূপ এবং জরতী বেশ ধারণের কথা বললেন।

কাশীতে দেবী অন্নপূর্ণার আত্মপ্রকাশ। এরপর দেবী অন্নপূর্ণা বৃদ্ধা জরতী বেশ ধারণ করে ব্যাস দেবকে ছলনা এবং বাঙালি গৃহস্থ ঘরের ঘরণী সেজে ঈশ্বরী পাটনীকে বর দান। গঙ্গার অপর পাড়ে কাশী নির্মাণ করবার জন্য ব্যাসদেব সাধনায় নিমগ্ন হয়েছেন। ভক্তের ডাকে ভগবান বা দেবী কেউই চুপ করে থাকতে পারেন না। দেবী অন্নদাও পারলেন না। তিনি ব্যাসদেবকে বর দিতে চলে এলেন বৃদ্ধা নারী বেশে। এই বৃদ্ধা নারীর বর্ণনায় পাই-

''মায়া করি মহামায়া হইলেন বুড়ী। ডানি করে ভাঙ্গা লড়ী বাম কক্ষে ঝুড়ি।।
ঝাঁকর মাকর চুল নাহি আঁদি সাঁদি। হাত দিলে ধূলা উড়ে যেন কেয়াকাঁদি।।
ডেঙ্গর উকুন নিকি করে ইলিবিলি। কোটি কোটি কানকোটারির কিলিকিলি।।
কোটরে নয়ন দুটি মিটি মিটি করে। চিবুকে মিলিয়া নাসা ঢাকিয়া অধরে।।
ঝর ঝর ঝরে জল চক্ষু মুখে নাকে। শুনিতে না পান কানে শত শত ডাকে।।
বাতে বাঁকা সর্ব অঙ্গ পিঠে কুঁজভার। অন্ন বিনা অন্নদার অস্থি চর্ম সার।।''[৫১]

এই বুড়ী ব্যাসদেবকে বলতে লাগলেন কাশীতে মরলে কী লাভ হবে। ব্যাসদেব বললেন মোক্ষ লাভ হবে। বারবার একই প্রশ্ন করে ব্যাসদেবকে তিতিবিরিক্ত করে তুললেন। ব্যাসদেব রেগে গিয়ে বললেন- ''গদ্দর্ভ হইবে বুড়ী এখানে যে মরে।।''[৫২] এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধা 'তথাস্তু বলিয়া' বলে চলে গেলেন।

কাব্য-মধ্যে দেখা যায় হরি হোড় তিন স্ত্রী নিয়ে বেশ সুখেই ঘর করছিল, কিন্তু গোল বাধলো বৃদ্ধ বয়সে আবার নতুন করে বিয়ে করার মধ্য দিয়ে।

''আমনহাঁড়ার দত্ত ছিল ভাঁড়ুদত্ত। তার বংশে ঝড়ুদত্ত ঠক মহামত্ত।।
ধুমী নামে তার নারী বড় কন্দলিয়া। তার গর্ভে বসুন্ধরা জনমিল গিয়া।।''[৫৩]

এ কাব্যে বসুন্ধরার জন্ম নেওয়ারপর নাম হল সোহাগী। উত্তরাধিকার সূত্রে কোন্দল করার স্বভাব সোহাগীর মধ্যে দেখা যায়। বৃদ্ধ হরি হোড়ের তরুণী ভার্যা হয়ে সোহাগী প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় চার সতীনের কোন্দল। এই কোন্দলের ফলে-

''কন্দলে কন্দলে ক্রোধ হৈল অন্নদার। ছাড়িতে বাসনা হৈল কেবা রাখে আর।।''[৫৪]

এরপর দেবী সোজা ভবানন্দ মজুমদারের গৃহের দিকে যাত্রা করলেন। দেবী অন্নদা গৃহ ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গেই ধন-মান সবই গেল উড়ে।

ভবানন্দের গৃহে যাত্রাকালের সময় পরিচয় ঘটে ঈশ্বরী পাটনীর সঙ্গ। দেবী অন্নদা গৃহস্থ ঘরের কুলবধূ রূপে নদী পার হওয়ার জন্য ঈশ্বরী পাটনীকে ডাকতে লাগলেন। দু'জনের মধ্যে আলাপ-চারিতা সাঙ্গ হলে দেবী পাটনীর নৌকায় উঠে বসেন, দেবীর দেবীত্বের পরিচয় পেয়ে ঈশ্বরী পাটনী মুগ্ধ হন। দেবী পাটনীকে বর দিয়ে তার দারিদ্র মোচন করেছেন। অন্নদামঙ্গল কাব্যের খেয়া পারাপার করে একজন পাটনী। নাম তার ঈশ্বরী। এই পাটনী পুরুষ না মহিলা তা নিয়ে তর্কে না গিয়ে আমরা চর্যাপদ এবং মনসামঙ্গলের মধ্যে যেহেতু খেয়া পারাপারের কাজে মহিলারা নিযুক্ত থেকেছে তাই ঈশ্বরী পাটনীকে মহিলা হিসেবে চিহ্নিত করে তার চরিত্র বিশ্লেষণে যাওয়া যাক। ঈশ্বরী পাটনী সাধারণ নিম্নবিত্ত বাঙালি ঘরের নারী। কবি ভারতচন্দ্র এই চরিত্রটিকে আঁকতে বসে কোন চাটুলিকতাকে প্রশ্রয় দেননি। ফলে ঈশ্বরী পাটনী জীবন্ত, রক্ত-মাংসের মানবী চরিত্র হয়ে উঠেছে। দেবী অন্নদা গৃহস্থ ঘরের স্ত্রী সেজে নদী পার হওয়ার জন্য ঈশ্বরী পাটনীকে ডাকতে লাগলেন। ঈশ্বরী পাটনী একা কুলবধূকে দেখে দেবীর পরিচয় জানতে চেয়েছে। দেবী দ্ব্যর্থবোধক ভাষায় তাঁর যে পরিচয় দিয়েছেন তাতে একজন সাধারণ মানুষের মত ঈশ্বরী পাটনী ভেবেছে, ''যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কোন্দল''[৫৫] এবং আর ভেবেছে, এই নারী কুলীন-ঘরের বৌ, স্বামী দিন-রাত নেশা করে পড়ে থাকে, ঘরে আছে সতীন, তার জ্বালায় আজ এই বধূ ঘর ছেড়েছে। এরপর দেবী নৌকায় চড়ে বসে সেঁউতির উপর পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে সেঁউতি সোনা হয়ে যায়। পাটনী একজন সাধারণ নারীর মত দেবী অন্নদার কাছে বর চান। ঈশ্বরী পাটনী একজন অতি সাধারণ রমণীর মত বলেছেন- ''আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।''[৫৬] দেবী পাটনীকে শুধু এই বর দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না, ঈশ্বরী পাটনীকে আর প্রচুর ধন-সম্পদ দিয়ে তার দারিদ্রতাকে মোচন করে দিয়েছেন।

ভারতচন্দ্র কয়েকটি শব্দ-ভেদী বাণের মত তৎকালীন মায়ের চরিত্র অঙ্কন করেছেন মেনকার মধ্য দিয়ে। মেনকা চরিত্রটি বড় জীবন্ত। নারদ গৌরীর জন্য যে বর এনেছেন, তা দেখে মেনকা নিজেকে স্থির রাখতে না পেরে দেবর্ষি নারদকে বলেছেন-

''ও রে বুড়া আঁটকুড়া নারদা অপ্পেয়ে। হেন বর কেমনে আনিলি চক্ষু খেয়ে।।''[৫৭]

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

১। ভট্টাচার্য, আশুতোষ: বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ মুখার্জী এন্ড কোং লিঃ, কলকাতা, ২০০২, পৃ- ৫১১

২। https://bn.wikipedia.org/wiki/ জীবনানন্দ_দাশ

৩। ওঝা, শ্রী সুনীলকুমার: বিস্তৃত বাংলা পুঁথি, চতুর্থ খন্ড- সম্পা, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, দার্জিলিং, ১৯৯১, পৃ: ৫৮৭

৪। তদেব, পৃ: ৫৮৭

৫। তদেব, পৃ: ৫৮৭

৬। তদেব, পৃ: ৫৮৭

৭। তদেব, পৃ: ৫৮৭

৮। তদেব, পৃ: ৫৮৭

৯। ওঝা, শ্রী সুনীলকুমার: বিস্তৃত বাংলা পুঁথি, চতুর্থ খন্ড- সম্পা, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, দার্জিলিং, ১৯৯১, পৃ: ৫৮৭

১০। বিশী, প্রমথনাথ: বাংলা সাহিত্যে নরনারী, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা-২০, প্রথম মুদ্রণ, ২০০১, পৃ: ০৯

১১। চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম: চন্ডিকামঙ্গল কাব্য, সন্দীপকুমার মন্ডল, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-৭৩, প্রথম মুদ্রণ, ২০০৫, পৃ- ৩৬৭

১২। মুকুন্দ, কবিকঙ্কণ-বিরচিত: চন্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা), সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লী, ০১, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৯৩, পৃ- ১৮৫

১৩। চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম: চন্ডিকামঙ্গল কাব্য, সন্দীপকুমার মন্ডল, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-৭৩, প্রথম মুদ্রণ, ২০০৫, পৃ- ২৭৯

১৪। চক্রবর্ত্তী, ঘনরাম: শ্রীধর্ম্মমঙ্গল, শ্রী পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১২, পৃঃ ২৮-২৯

১৫। তদেব, পৃঃ ৩৯৩

১৬। তদেব, পৃঃ ৪৮০

১৭। তদেব, পৃঃ ৪৯৯

১৮। তদেব, পৃঃ ৬৩৯

১৯। তদেব, পৃঃ ৬৪০-৪১

২০। তদেব, পৃঃ ৬৪১-৪২

২১। তদেব, পৃঃ ৬৪২

২২। তদেব, পৃঃ ৬৪২

২৩। তদেব, পৃঃ ৪২৯

২৪। তদেব, পৃঃ ৪৪০

২৫। তদেব, পৃঃ ৫৯৬

২৬। তদেব, পৃঃ ৫৯৬

২৭। তদেব, পৃঃ ৬১৭

২৮। বসু, নরসিংহ ধর্মমঙ্গল: ড: সুকুমার মাইতি সম্পাদিত বিজন-পঞ্চানন সংগ্রহশালা ও গবেষণা কেন্দ্র, খড়গপুর- ৭২১৩০৫, প্রথম সংস্করণ- নভেম্বর ২০০১, পৃঃ ৮৩

২৯। চক্রবর্ত্তী, ঘনরাম: শ্রীধর্ম্মমঙ্গল, শ্রী পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১২, পৃঃ ১৬১

৩০। তদেব, পৃঃ ২৬২

৩১। তদেব, পৃঃ ২৬২

৩২। তদেব, পৃঃ ২৮৫

৩৩। তদেব, পৃঃ ২৮৫

৩৪। রামেশ্বরের শিব-সঙ্কীর্ত্তন বা শিবায়ন, শ্রীযোগিলাল হালদার (সম্পা) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১২ পৃ- ভূমিকা, সাতাশ

৩৫। তদেব, পৃ- ২৬২

৩৬। দত্ত, জয়িতা: নূতন মঙ্গল আশে ভারত সরস ভাষে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, রত্নাবলী, কলকাতা-০৯, পৃ- ৬৬

৩৭। তদেব, পৃ- ৬৬

৩৮। তদেব, পৃ- ৬৬

৩৯। তদেব, পৃ- ৬৬

৪০। তদেব, পৃ- ৬৬-৬৭

৪১। তদেব, পৃ- ১০১

৪২। তদেব- ১০১-১০২

৪৩। তদেব- ১০২

৪৪। তদেব- ১০২

৪৫। তদেব- ১০৩

৪৬। তদেব- ১০৩

৪৭। তদেব- ১০৩

৪৮। তদেব- ১০৩

৪৯। তদেব- ১০৪

৫০। তদেব- ১০৪

৫১। তদেব, পৃ- ৯৭

৫২। তদেব, পৃ- ৯৮

৫৩। তদেব, পৃ- ১০৫

৫৪। তদেব, পৃ- ১০৫

৫৫। তদেব, পৃ- ১০৯

৫৬। তদেব, পৃ- ১০৯

৫৭। তদেব, পৃ- ৫৯